ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক চিকিৎসা

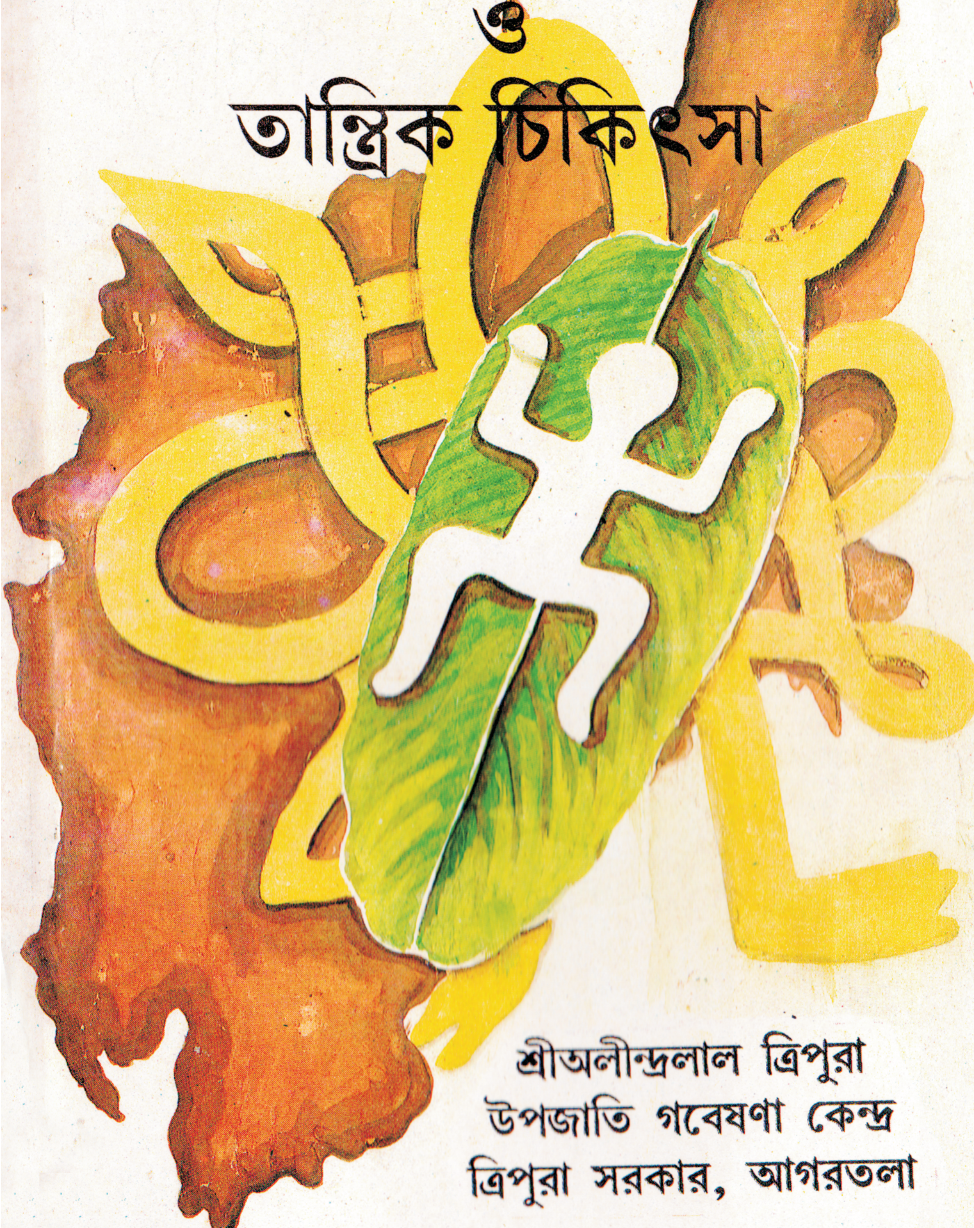

শ্রীঅলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

ত্রিপুরার উপজাতীয় সংস্কৃতি
ও
তান্ত্রিক চিকিৎসা

লেখক : অলীন্দ্র লাল ত্রিপুরা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা অধিকার

TRIPURA UPAJATI SANSKRITI TANTRIK CHIKITSSHA

প্রকাশক:-

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষনা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা অধিকার।

আগরতলা, ত্রিপুরা সরকার।

প্রথম সংস্করন :- নভেম্বর, ১৯৯৪ইং।

কপি রাইট :- ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহ শালা অধিকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মুদ্রন :- ভারত অফসেট ।

১, রোনাল্ডসে রোড।

আগরতলা,ত্রিপুরা।

প্রচ্ছদ অলংকরন :- শ্রী প্রাঞ্জলকৃষ্ণ দেববর্মা।

উজীরবাড়ী, আগরতলা।

মূল্য :- ৪৫ টাকা।

ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতির উপর গবেষণালব্ধ ও তথ্যমূলক গ্রন্থাদি ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র হতে প্রতিনিয়ত প্রকাশনার কাজ চলছে। শ্রী অলীন্দ্র লাল ত্রিপুরার ''ত্রিপুরার উপজাতীয় সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক চিকিৎসা'' গ্রন্থটির প্রকাশনাও এর একটি অঙ্গ।

শ্রী ত্রিপুরা গ্রন্থটিতে উনার ব্যক্তিগত জীবনের নিরলস শ্রম ও তথ্যানুসন্ধান করে উপজাতি সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, পূজার্চ্চনা ও চিকিৎসার বিভিন্ন দিক সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই গ্রন্থটি তান্ত্রিক চিকিৎসার উপর একটি মূল্যবান ও মৌলিক গ্রন্থ। আশা করি, পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

প্রকাশনার কাজে পরিমার্জন ও সংযোজন একাধিকবার করতে হওয়ায় এই গ্রন্থটি সময়মতো প্রকাশ করা যায় নি।

পাঠকমহলে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হলে অত্যন্ত খুশী হবো।

(সাইলিয়ানা সাইলৌ)
অধিকর্তা,
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা, ত্রিপুরা।

ভূমিকা

মাননীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষে সেমিনারে আলোচনাক্রমে Preparation of Research project on charms and magic of the Tribes of Tripura' নামক বিষয়বস্তুটি কর্মসূচী হিসাবে আমার উপর কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হইলে উক্ত কাজের জন্য আমি গত ৪/৯/৯০ইং তারিখে আবেদন জানাই। উক্ত আবেদনের মূলে The Director of Research Govt. of Tripura অফিস নং F. 2(88)/DR/90 dated, Agartala the 6th Nov. 1990, কাজ করার সম্মতি প্রদান করেন।

অধিক বয়সে নানা প্রতিকুল অবস্থায় যথাসাধ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকি। যথা - চিরাচরিত আদিবাসীর সামাজিক আচরণ, বিশ্বাস, পূজার মন্ত্র, কতিপয় সাধারণ রোগের ঝাড়াফুঁকাদি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে ত্রিপুরী উপজাতীয় জনগণের জাগতিক ধারণা ও পারলৌকিক ধারণাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আদিবাসী সমাজের তান্ত্রিক চিকিৎসায় যাবতীয় রোগ ও রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিল কারণ প্রাচীন কালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিলনা। তান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় (১) দেব পূজা, (২) মন্ত্রে ঝাড়াফুঁকা, (৩) কবচ ধারণ, (৪) বনজ লতাগুল্মের গুণাগুণে তৈয়ারী ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

এই পুস্তকে যেসব গাছগাছড়ার নাম ঔষধ হিসাবে লিখিয়া বুঝানোর প্রয়োজন, সার্থক বাংলা প্রতিশব্দ না জানার দরুন তাহা সকলের বোধগম্য করা সম্ভব না হওয়াতে দুঃখিত। ত্রিপুরারাজ্যের উপজাতীয়দের আদিম বিশ্বাসাদি ও তদ্‌সহ কিছু মন্ত্র ঝাড়া ফুঁকাদি লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার প্রদত্ত মন্ত্রতন্ত্র ও ঔষধাদি কাহারো কিঞ্চিৎ উপকার হইলে আমি আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব।

এই পুস্তক প্রকাশনে গবেষণা অধিকর্ত্তা ও কর্মকর্ত্তাগণ সহায়ক হইয়াছেন। তজ্জন্যে ডিরেক্টর রিসার্চ মহোদয় শ্রী এল সি দাস ও তাহার সহকর্মীগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি

শ্রী অলীন্দ্র লাল ত্রিপুরা
গ্রন্থকার।

১লা জুন ১৯৯১ ইং
লাটিয়াছড়া।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় (১-৫৭ পৃ:)

১। ত্রিপুরা আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তান্ত্রিক চিকিৎসা।
২। ধর্ম সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ।
৩। বাথু তত্ত্ব।
৪। ত্রিপুরী উপজাতি লোকসমাজে প্রচলিত ও পূজিত দেবদেবী সমূহ।
৫। অপদেবতার নাম ও তাহাদের প্রতি ধারণা।
৬। আদিবাসী জনগণের বাসস্থান, ভৌগলিক পরিবেশ ও ইহার প্রভাব।
৭। সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় দেবদ্বয়ের কাহিনী।
৮। পার্বত্য জনগণের সামাজিক আচরণ, বংশপরম্পরায় অভ্যাস ও শিক্ষা।
৯। আদিবাসী জনগণের রোগ উৎপত্তির ধারণা ও যাদুমন্ত্র বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় (৫৭-৭১ পৃ:)

১০। যাদুমন্ত্র, কবচ, পূজা বিশ্বাসী কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা।
১১। রিয়াং ও ত্রিপুরী জনগণের সম্পর্কে জনশ্রুতির আলোকে আলোচনা।
১২। অচাই:- তাহার গুরুত্ব ও কার্য্যাবলী এবং সমাজে তাহার স্থান।
১৩। ফলাবাদ ও পরকালের ধারণা ও প্রবচন।
১৪। অচাই চিকিৎসালয় পরিকল্পনা।
১৫। সমাজ উন্নয়নে ভাষার গুরুত্ব ও ককবরক উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায় (৭২-১০০ পৃ:)

১। প্রার্থনা।
২। সাধারণ দেবপূজায় উচ্চারিত সংকল্প বাক্য ও স্তুতি।
৩। নদী বন্দনা।
৪। শিশু চিকিৎসার মন্ত্র।
৫। প্রসূতি পরিচর্য্যা।
৬। পাগলা কুকুরের দংশন ও চিকিৎসা।
৭। সর্পদংশন চিকিৎসা।
৮। মাতৃরোগ ঝাড়া ও চিকিৎসা।
৯। কতিপয় সাধারণ রোগের প্রতিকার।
১০। পাগল চিকিৎসা।
১১। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা।
১২। কয়েকটি আকস্মিক রোগের চিকিৎসা।

পরিশিষ্ট

(১) বুড়াছা আশর কবচ,
(২) মৃত বৎস্যা কবচ।

প্রথম অধ্যায়

(১) ত্রিপুরা আদিবাসীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তান্ত্রিক চিকিৎসা

উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট:-

উপজাতীয় সমাজ, যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সেইসব সংস্কৃতিকে, উপজাতীয় সংস্কৃতি বলা যায়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক। সংস্কৃতি একটা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন প্রবাহের পূর্ণরূপকে বুঝায়। জন্ম, মৃত্যু, ধর্ম বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, আইন-আদালত, সামাজিক কার্য্যকলাপ সকলই সংস্কৃতিব অন্তর্ভুক্ত। একটা জনসমষ্টি জীবিত থাকিতে সমাজ ব্যবস্থা ও আইন কানুন, ধর্মীয় ব্যবস্থা যাহা প্রয়োজন তাহাই সংস্কৃতি। শুধু জীবিত অবস্থায় নয় তা মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থাতেও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহমান। সংস্কৃতি ধর্ম বিশ্বাসের সহিত অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

সৃষ্টির আদিযুগ হইতে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর লোক জীবন জীবিকার পথে বাধা বিঘ্ন ও বিপদের সংগে লড়াই করিয়া বংশ বিস্তার ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী সেই লড়াই এর রূপ ভিন্ন ভিন্ন। কোনটি বা সমতুল্য। মৃত্যু ভয়, ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক চিন্তাই মূল কারণ। মানুষ ইহকাল ও পরকাল, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিণাম চিন্তা করে। তাই ইহকালে বাঁচিয়া থাকার ও পরকালে পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া ইহকালে সুখে বাঁচিয়া থাকার ও পরকালে সুপরিণতির উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কর্ম ও আচরণ অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে। এই চিন্তাধারা ও আচরণ প্রতি দেশের মানব গোষ্ঠীরই প্রায় এক বা সমতুল্য। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় ও বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের মানুষ বাস করে।

সব দেশের মানুষের চিন্তাধারা প্রায় এক ও সমতুল্য। যেমন, মনুষ্যজাতি আগুনের সাহায্যে রান্না করিয়া খাওয়ায় রুচি, আগুনের ব্যবহার, আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহার, বৎসর গণনা, মাসগণনা, দেবকল্পনা, ঈশ্বরের অস্তিত্ববোধ ইত্যাদি ভাব ও কল্পনা প্রায় বিভিন্ন দেশের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় এক ও সমতুল্য। ইহকালে বাঁচিয়া থাকার উপায় ও ব্যবস্থা প্রায়

সমতুল্য। তাই আশ্রয়ের জন্য গৃহ নির্মাণ, শীত-গ্রীষ্ম বা লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের ব্যবহার, আহারের চিন্তা, রোগমুক্তির জন্য উপায় উদ্ভাবন প্রতি দেশের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের রোগমুক্তির উপায় হিসাবে উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন:-

১) আয়ুর্বেদ, ২) হেকিমি চিকিৎসা, ৩) বায়োকেমিক, ৪) হোমিওপ্যাথিক, ৫) এ্যালোপ্যাথিক, ৬) হাইড্রো প্যাথিক ও ৭) আকু পাংচার। পর্বতবাসী উপজাতিগণ রোগমুক্তির উপায় হিসাবে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ ব্যবস্থাকে তান্ত্রিক চিকিৎসা বলা যায়। তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে দেশীয় গাছ গাছড়া, লতাপাতা, শিকড় বাকল সংগ্রহ করিয়াও ঔষধ তৈয়ারী করা হয়। ইহা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বা কবিরাজীর চিকিৎসার অঙ্গ।

তৃনগুল্মের রস সিদ্ধ করিয়া ঐ রস পচন নিবারণ করার ব্যবস্থা অজানা থাকায় রসায়ন জাতীয় ঔষধ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিতে দেখা যায় না। তান্ত্রিক পূজা, মন্ত্রে ঝাঁড়া, কবচ ধারণ ও ঔষধ ব্যবহার করাই তান্ত্রিক চিকিৎসার অঙ্গ। ধর্মবিশ্বাস সংস্কৃতির উৎস। আবার ধর্ম-সংস্কৃতি মানুষের প্রধান সংস্কৃতি। উপজাতীয় দেব ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ও রোগ নিরাময়ের জন্য অবলম্বিত পন্থা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

২। ধর্ম সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ

প্রতি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ধর্ম আছে, যদি তাহারা নিজেদের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এইসব ধর্মের আওতাভুক্ত হলেও পাশাপাশি তাহাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস আছে তাহা সর্বপ্রাণবাদের সমতুল্য। প্রাণবাদ বা জড়বাদ ইংরাজীতে যাহাকে Animismবলা হয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুর অন্তরালে একটি শক্তি নিহিত আছে এবং এই শক্তির বলে তাহারা জীবিত থাকে। সেই শক্তিতে আস্থা জ্ঞাপনই প্রাণবাদ বা এ্যানিমিজম। টিপরা উপজাতীয় লোকেরা, জল বা নদী, অগ্নি,পর্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, ধান্য, কার্পাস প্রভৃতিকে একএকটি দেবতা মনে করে। হিন্দুধর্ম সর্বপ্রাণবাদ হইতে মুক্ত নহে। তাই উচ্চতর ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক উপজাতিদের আদিবিশ্বাস সহ তাহাদিগকে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। চতুর্দ্দশ দেবতা মন্দিরে তিপ্রাদের যেসব দেবদেবীগণ পূজিত হয় সেইসব হিন্দুদেরই দেবদেবী। তথাপি বেদোক্ত

দেবদেবীর সহিত হিন্দু বলিয়া পরিচিত উপজাতীয় দেবদেবীর নাম ও আচার অনুষ্ঠান পূজাদি এক নহে। বড়ো, মেচ, কুচ, কাছাড়ী, লালং, হাইজং, গারো প্রভৃতি উপজাতীদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এক এবং তাহাই সর্বপ্রাণবাদ। তিপ্‌রাদের 'মলিখামানি' পূজাদিতে ফলবান বৃক্ষের নীচে পূজার আসন দেওয়া হয়। যে বৃক্ষের নীচে পূজা দেওয়া হয় ঐ জাতীয় বৃক্ষের ফল সন্তানের মাতার খাওয়া নিষেধ। ছেলে বা মেয়ে হাঁটিতে না পারা পর্য্যন্ত ফল খাইতে পারিবেনা। হিন্দুশাস্ত্রে বৃক্ষ পূজার প্রচলন ব্যাপক, যেমন তুলসী, বট, অশ্বত্থ, বেল বৃক্ষাদি পবিত্র বৃক্ষ হিসাবে পূজিত হয়। সুতরাং উপজাতীয় লোকের ধর্ম বিশ্বাসের ভাব ও কল্পনা পরবর্ত্তীকালে মুণি-ঋষিদের ধ্যানধারণা লব্ধজ্ঞান মিলিতভাবে হিন্দুশাস্ত্র সম্প্রসারিত ও পুষ্ট হইয়াছে।

বেদ, পুরাণ এবং সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখিত দেবদেবী ছাড়াও উপজাতীয় লোকের দেবদেবী সম্পূর্ণ পৃথক ও এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া মন্ত্রতন্ত্র পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভুত হইয়াছে। বেদে শিব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নাই। শুধু 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম' এই তিন শব্দই লিখিত হইয়াছে। শিবকে কীরাট দেবতা বলা হইয়াছে। অধিকাংশ উপজাতীয় লোকের প্রধান দেবতা সিব্রাই। বড়োদের ভাষায় 'জীউ' মানে প্রাণ। জীউব্রায় হইতে শিব্রাই ক্রমে শিব্রায় শব্দ হইতে শিব শব্দে রূপান্তর হইতে পারে।

শিব্রাই বড়োগোষ্ঠির জনগণের সর্বদেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা। শিব্রাইকে 'বাথু ব্রায়' ও বলা হয়। বুড়া বাথু মহারাজা। প্রতি দেবতাকে রাজা বলে সম্বোধন করিয়া আহ্বান করা হয়। 'রা' মানে পরিণত বয়স 'অক্রা' : বয়োজেষ্ঠ্য 'জা' মানে পতি। রাজা মানে অধিশ্বর ও বয়োজেষ্ঠ্য। সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন অনাদিকাল স্থায়ী অধিপতি। সেইরূপ 'রা' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বোধক শ্রী কলাক্ষি রাজা, শ্রী মা গংগি রাজা, অনুপক্ষী রাজা, বাগবল রাজা, উড়োপক্ষী রাজা, বাবুই গড়েয়া রাজা, শ্রী বনমালী রাজা ইত্যাদি বাক্য দেবমন্ত্রে উচ্চারিত হইয়া সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্বোধিত হইয়াছে। এইসব দেবদেবীর পূজা অর্চনায়, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে, ও পরকালের বিশ্বাসকে ঘিরিয়া যেসব গল্প, রূপকথা, গীতের মাধ্যমে উপজাতীয় সংস্কৃতি পল্লবিত হইয়াছে, সেইসব ধ্যান-ধারণায় ও তন্ত্রেমন্ত্রে আজও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বোধক 'রা' শব্দটি বহুল পরিচিত। সুতরাং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও ধর্মবিশ্বাস উপজাতী সমাজ কাঠামোর ও সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ।

৩। বা-থু তত্ত্ব

সুব্রাই বা শিব্রায়কে বাথুব্রায়ও বলা হয়। যেমন বুড়া বাথু মহারাজা। বুড়া মানে অনাদি- অনন্ত;'বা' মানে পাঁচ; 'থু' মানে 'গৌথু' বা 'কুথুক' - যাহার বঙ্গার্থ গভীর তত্ত্ব। বাথু মানে পঞ্চতত্ত্ব। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম - এই পঞ্চ উপাদানের তত্ত্ব। এই পঞ্চ উপাদানই শক্তি এবং জীব সৃষ্টির মূল উপাদান। এই পঞ্চ উপাদান দ্বারা কিভাবে জীব সৃষ্টি হইল, সৃষ্ট জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ই হইল বাথুতত্ত্ব। শিব্রাই বা বাথুব্রায় প্রাণ (জিউ) উৎপত্তির তত্ত্ব। শিব্রাই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ও উপাস্য দেবতা। শিজৌবৃক্ষ, ধুতুরা, শিঙ্গা, বেল প্রভৃতি বাথুতত্ত্বের পবিত্র পূজার উপকরণ। শিব্রাই আদি দেবতা তথা অনার্য্য দেবতা যাহা কিরাটদের প্রধান উপাস্য দেবতা হিসাবে পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে শিব ও শক্তির আরাধনা হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ উপাদান উপযোগীতা লাভ করিয়া প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তীতায় জীবকোষের সমষ্টি দ্বারা দেহের আকার ধারণ করে ও প্রকৃতি শক্তির প্রেরণায় ক্রমে বৃদ্ধি হয় পরে বৃদ্ধ হয় ও জড়ত্বে পরিণত হয় - আবার জীবসৃষ্টির উপাদান যোগায়। জীবের দেহ ধারণ করাটাই সিউ এর সৃষ্টি কার্য্য। এইজন্য বলা হয় 'যত্র জীব তত্র শিব'। বড়ো ভাষায় ঈ: ছর, মানে সে কে ? কে সে সৃষ্টিকারী। এই শব্দটাই পরে ঈশ্বর শব্দে পরিণত হইয়াছে। শিব্রাই, বাথুব্রাই বা বুড়া বাথু মহারাজা সেই ঈশ্বর হিসাবে কল্পিত ও পূজিত হইয়াছে। সম্ভবত: শৈব ধর্মই পৃথিবীর আদি ধর্ম। এই ধর্মই সর্বপ্রাণবাদ। কেননা 'যত্র জীব তত্র শিব'। অর্থাৎ প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুর আড়ালে আছে একটা অন্তর্নিহিত শক্তি। সেই শক্তি যখন স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া প্রাণীরূপে প্রকাশ পায়, সেইটিই শক্তির শিবে প্রকাশ। এই শ্মশান অধিপতি শিবের অনুচরবর্গ হইল ভূত, প্রেত, শিজি মাংজি, ডাইন,ডাকিনী, যোগিনী। মনে হয় টিপরাদের সমাজে পূজিত দেবদেবীও কিছুটা সেই ধরণের, কিছুটা জড়বস্তুর অধিষ্ঠাতা দেবসমূহ। কিছুটা মাঙ্গল্য দেবদেবী। এইসব দেবদেবীর বশীকরণ বিতাড়ন কার্য্যই তান্ত্রিকতা। তান্ত্রিক সাধনায় লব্ধ বিদ্যা সমূহ হইল - (১) সম্মোহণ, (২) বিদ্বেষণ, (৩) স্তম্ভন, (৪) বশীকরণ, (৫) উচাটন। তান্ত্রিক চিকিৎসা এই তান্ত্রিক সাধনায় লব্ধ বিদ্যা বলিয়া মনে হয়।

৪। ত্রিপুরী (তিপ্‌রা) উপজাতি লোক সমাজে প্রচলিত ও পূজিত দেবদেবী সমূহ

ত্রিপুরী সমাজে পূজিত দেবদেবী চৌদ্দটিই প্রধান। তাঁহাদের নাম (১) সুকুন্দ্রায়, (২) মুকুন্দ্রায়, (৩) কালেয়া, (৪) গড়েয়া, (৫) ইখিত্রা, (৬) বিখিত্রা - এই ছয়টি দেবতা এককভাবে পূজা পায়। (ক) সুকুন্দ্রায় -মুকুন্দ্রায় এই দেবদ্বয় যুগ্মভাবে যখন পূজিত হয় তখন এই যুগ্ম দেবতার নাম কাথারক। (খ) কালেয়া-গড়েয়া যখন যুগ্মভাবে পূজিত হয় তখন এই দেবদ্বয় বণিরক নামে পরিচিত হয়। (গ) ইখিত্রা-বিখিত্রা এই দেবদ্বয় যখন যুগ্মভাবে পূজিত হয় তখন তাহাদের নাম থুবনাইরক হিসাবে পরিচিত। একক হিসাবে ছয়টা এবং যুগ্ম হিসাবে তিনটা। মোট নয়টি পুরুষ দেবতা। এছাড়া আরও আছে পাঁচটি দেবী। পাঁচটি দেবীর নাম - (১) মাইলুংমা - ধান্য ফসলাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (২) খুলুংমা - কার্পাস ও বস্ত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (৩) তুইবুকমা অর্থাৎ জল বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (৪) হাচুকমা পর্বতের অধিশ্বরী, দেবী পার্বতী। তাহার স্বামীর নাম বুড়াছা। (৫) সাংগ্রংমা হাতী -পাল্কী- রথ প্রভৃতি যানবাহনের দেবী। মগের ভাষায় স্যাং-মানে হাতীকে বুঝায়।

উপজাতীয় লোকসমাজে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন নাই। পূজা অনুষ্ঠানে পূজার আসনে দেবতার প্রতীক হিসাবে নিম্ন বর্ণিত প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হয়।

ওয়াথপ:- দেড়হাত পরিমিত ছয়টুকরা কাঁচা বাঁশ কাটিয়া লইয়া দা দিয়া আঁছিয়া সোজা ও বক্র রেখা দ্বারা কারুকার্য্য করা হয়। চারি টুকরা বাঁশ বামে একজোড়া ডাইনে একজোড়া মাটিতে লম্বভাবে এইচ-এর ন্যায় পুঁতিয়া দেওয়া হয়। আড়াআড়িভাবে দুই টুকরা বাঁশ ঐ পূর্বোক্ত চার টুকরার সহিত এইচ-এর আকারে বাঁধা হয়। এইরূপ দেবকল্পনায় অধিষ্ঠানের প্রতীককে 'ওয়াথপ' বলা হয়। একটি ওয়াথবই দেবতার প্রতীক। একটি ওয়াথপে দুইজোড়া বাঁশ টুকরাকে যুগ্ম দুইদেবের প্রতীক বুঝায়। 'দিক' রক্ত গ্রহণকারী প্রতীক। বাঁশের কঞ্চিতে পাঁচটা আশঁ তুলিয়া নিচের অংশ মাটিতে পুঁতার জন্য সুঁচালো করিয়া কাটা হয়। পূজাতে ছাগ, মোরগ, হাঁস, কবুতর বলি দেওয়া হয়। একটা দিক পুঁতিয়া পূজা দেওয়া হয়। পূজাতে বলিবধ্য জীবের রক্ত উৎসর্গের জন্য ওয়াথপের সামনে দিক পুঁতা হয় ও দিক এর নীচে

কলাপাতার থালা পাতিয়া রাখা হয়। ওয়াথপে একটা টুকরা বাঁশ দুই হাত দৈর্ঘ্যে আঁছিয়া কারুকার্য্য সহ হেলাইয়া রাখা হয়। দুইটা বাঁশের চোঙা জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়। উহা ওয়াথপের বামে ও ডাইনে এক্স-এর মতো আড়াআড়ি দুই কঞ্চির উপর জলচোঙাগুলি রাখা হয়। এক্স-এর মতো কঞ্চিকে বলা হয় কাইতেবে। হেলানো সজ্জিত টুকরাকে বলা হয় নাগ্রী। দুই চোঙার জল দ্বারা দেবতার পা ও মুখ ধোঁয়ার জন্য, প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা শুরু করা হয়।

'খং'- একটা কাঁচা বাঁশের কঞ্চি এক বিঘত দূরত্বে আঁছিয়া কারুকার্য্য করিয়া দিক এর গা ঘেঁষিয়া কঞ্চির দুইদিক মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। উহাকে বলা হয় খং। পূজার ফুলের মালাকে (খুমত্রুং) বা খুমতীরাং বলা হয়। এইসব সামগ্রী দেবপূজার প্রতীক বা উপকরণ। ওয়াথপ এইচ আকারে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয় - উহাই দেবাসনের প্রধান দেবপ্রতীক।

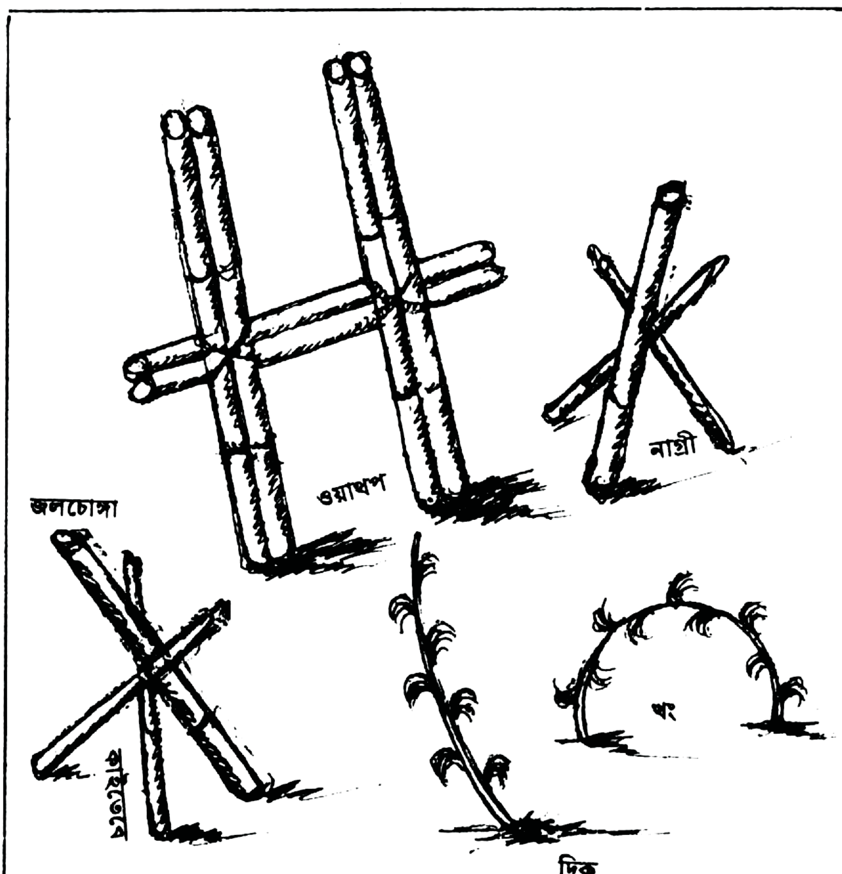

প্রায় প্রতি পূজায় ওয়াথপ দেবতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উহাকে লাম্প্রা ওয়াথপও বলা হয়। টিপরা সমাজের দেবপূজাকে মোটামুটি দুইভাবে ভাগ করা যায়। টিপ্রাদের আদি পেশা জুম। জুমকে কেন্দ্র করিয়া ফসল বৃদ্ধি ও ফসল রক্ষার জন্য পূজা হয়। রোগ নিরাময়ের জন্য অপদেবতার পূজা। বসন্তের সমাগমে যখন বিহঙ্গকুল কলরবমুখর, তখন বনে বনে বৃক্ষকুল কচি কিশলয়ে ও সুরভিত মুকুলে মুকুলিত হয়। তখনই ঐ বন্যফুলে জুম কাটার উদ্দেশ্যে দেবদেবীর পূজা সূচনা হয়। সুকুন্দ্রায় -মুকুন্দ্রায় এই দেবদ্বয় সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পূজিত হয়। জুম করার উদ্দেশ্যে গভীর বন নতুন দা দিয়া কাটিতে হয়। তখন বড় বড় বৃক্ষাদি কাটার সময় হাত -পা কাটা যাইতে পারে। কর্তিত বৃক্ষাদি গায়ের উপর আসিয়া পড়িতে পারে। ঐসব অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটার জন্য ওয়াথপ স্থাপন করিয়া সুকুন্দ্রায়-মুকুন্দ্রায় দেবের পূজা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে দুই দেবতাকে দুইটি মোরগ বলি দেওয়া হয়। এই পূজা শেষ হইলে সংসারে শান্তি কামনায় ওয়াথপ স্থাপন করিয়া কাথারক নামে যুগ্ম দেবতার পূজা দেওয়া হয়। কাথারক পূজায়ও দুইটি মোরগী বলি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পর কালী পূজা। কালী পূজাতে চিনি, বাতাসা, আতপ চাউল, কলা সহকারে পূজা বেদীতে নৈবেদ্য ভোজ্য নিবেদন করা হয় ও একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। এই কালী পূজার সংগে নদীতে একটা পাঁঠা বলি দিয়া তৗয়বুকমা পূজাও দেওয়া হয়। গ্রামবাসী সকলে মিলিত হইয়া এইসব পূজা করে এবং বলিবধ্য জীবের মাংস সকলে মিলিতভাবে রান্না করিয়া খায়। গ্রামবাসীর আর এক পূজা কের পূজা। কের পূজাও জুম কাটার পূর্বে করা হয়। এই পূজায় কালী তৈবুকমা, মাইলুংমা, খুলুংমা, ইখিত্রা, বিখিত্রা কালেয়া, কলেয়া, বুড়াছা, বণিরক থুবনাইরক, হাচুকমা সাংগ্রংমা, প্রায় সব দেবদেবীই মিলিতভাবে পূজা পায়। মহামারী রোগ ব্যাধি না হওয়ার কামনায়, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী যাহাতে ফসল নষ্ট না করে এইসব কামনায় কেরপূজা করা হয়। অচাই এইসব পূজায় পুরৌহিত্য করেন ও প্রতি পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু মদ উৎসর্গ করিয়া অবশিষ্ট মদ, মাংসের সহিত গ্রামবাসীরা ভোগ করে। গ্রামে থাকে চৌধুরী ও কামিফাং। অচাই, বারোয়া, গ্রামবাসী সকলেই চৌধুরীর বাড়িতে সমবেত হয়। চৌধুরী বাড়ীতে পূজার পূর্বে চাঁদার ব্যাপারে আলোচনা সভা হয়। চাঁদা সংগ্রহ হইলে পূজার প্রয়োজনীয় যাবতীয়

উৎসর্গ করার সামগ্রী ও বলিবধ্য জীবসমূহ চৌধুরীর বাড়ীতে রাখা হয়। চৌধুরীর নামে অচাই পূজা অনুষ্ঠান ও নৈবেদ্য দেবতাকে উৎসর্গ করে। চৌধুরী গ্রামাবাসীর প্রতিনিধি। পূজার শেষে সমস্ত উৎসর্গীকৃত সামগ্রী লইয়া সকলে চৌধুরীর বাড়ীতে মিলিত হয়। সেখানে বলি দেওয়া পশুর মাংস রান্না করিয়া ভোজন করা হয়। সংগে মদ্য পানও চলে। কামিফাং গ্রামের সর্দার তাহাকে বিশেষ উৎসর্গীকৃত প্রসাদ দিয়া সম্মান করা হয়। মাঘ মাসে জুম কাটা শেষ হইয়া যায়। কাটা জুম পাহাড় পর্বত জুড়িয়া চৈত্র মাসে শুকাইতে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে গড়েয়া পূজার সূচনা হয়। গড়েয়া পূজায় মোরগ, পাঁঠা ও ফলমূল উৎসর্গ করা হয়,পশু বলি দেওয়া হয়। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনকে বলা হয় হাড়ি বিষু। চৈত্র সংক্রান্তি গড়েয়ার প্রতিষ্ঠানের দিন। সেই দিনকে বলা হয় বিষু। রিয়াং সম্প্রদায় হাড়ি বিষুর দিন হইতে গড়েয়া উৎসবে মাতিয়া উঠে। গড়েয়া নৃত্যে আছে বাইশ তাল। ঢোল ও বাঁশী বাজাইয়া গড়েয়া নৃত্য চলে। গড়েয়া নাচকে খেরেবাই তাল বলে। নৃত্যকারী দলকে 'গড়েয়ানি সেংজারক' বলা হয়। এই নৃত্য বৈশাখের সাত তারিখ অবধি থাকে। গড়েয়া প্রতীক সহ সাতদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নৃত্য করে। সাত দিনের পর পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে, দেব প্রতীক বেদীতে স্থাপন করিয়া পূজার শেষে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

গড়েয়া দেবতার প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও দফা ভেদে পার্থক্য দেখা যায়। পাঁচ হাত বা সাত হাত পরিমিত একটা বাঁশ লইয়া এক প্রান্তের আড়াই হাত নীচে গাঁইটের কিঞ্চিৎ উপরে ছিদ্র করিয়া একটা শক্ত কঞ্চি বাঁশের সহিত আড়াআড়িভাবে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। কঞ্চির উভয় প্রান্তে চুলের মতো উগুলি দড়ি দুই গোছা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বাঁশের উপরিভাগে গোলাকার কাঠের তৈয়ারী মুখমন্ডল বসানো হয়। এরূপ প্রতীক আসলং, কেওয়া, আনক দফার মধ্যে ব্যবহার করা হয়। রিয়াং ও পুরাণ টিপ্রা, আসনে বাঁশের অগ্রভাগ সহ মাটিতে পুঁতিয়া প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে। নৃত্যরত অবস্থায় একটা শূলে রিসা বাঁধিয়া দেবপ্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে। জমাতিয়াগণ অষ্ট ধাতু ও স্বর্ণনির্মিত গড়েয়া মূর্ত্তি ব্যবহার করে।

ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কি উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল উপজাতিগণের দেবতার প্রতীক বাঁশের তৈয়ারী। বাঁশ দ্বারা ওয়াথপ দিগ, খং, থারুক, নাগ্রী,মারই, লাহান, কাইতেবে ইত্যাদি পূজার বেদীর সাজ সরঞ্জাম তৈয়ার করা হয়।

প্রত্যেক দেবতার পূজায় আসন সাজাইয়া এইসব প্রতীক উপাদানের দ্বারা সাজসজ্জা করা হয়। ফল, ধূপ, জল, খই, চাউলের পিঠা, শুকনা চাউল বাটা পাউডার, হলদি, ফুল, আম্র পল্লব, কলা, চিনি, বাতাসা, চাউল, ফুলের মালা, দুর্বা, তুলসী পাতা নৈবেদ্য উৎসর্গের কাজে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু দেবদেবীর পূজার উপকরণগুলি সম্পূর্ণ উপজাতীয় উপকরণ হইতে গৃহীত হইতে পারে। ইহা ছাড়া আসনে নব বস্ত্র, তেল, সিন্দুর, দূর্বা, বিল্বপত্র ইত্যাদিও উপকরণ হিসাবে উৎসর্গ করা হয়। কোন কোন পূজায় রান্নাভাত, তরকারী, শাক্সব্জীও উৎসর্গীকৃত হয়। এইসব পূজা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কর্মেও করা হয়। অচাই বা পুরোহিত এইসব পূজা করিয়া থাকে। এইসব পূজা রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে, অপদেবতা বিতাড়নে, ঐশ্বর্য্য বা সমৃদ্ধি কামনায়, শত্রু দমণের উদ্দেশ্যে, নব দম্পতির মঙ্গল কামনায়, শুভ যাত্রায় পূজিত হইয়া থাকে। ইহকালে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এবং পরকালে আত্মার শান্তির জন্য এইসব দেবদেবীর পূজা করা হয়। এইসব বাঁশের তৈয়ারী প্রতীক সমূহে 'ওয়াথপ্'-ই প্রধান প্রতীক। এইসব পূজার সাজসজ্জায় উপজাতীদের পুষ্পপ্রিয় মনোভাব, সৌন্দর্য্য প্রিয় সুরুচি, সুগন্ধির দ্রব্যের আদর, ও শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পূজায় ও সজ্জায় ফুলের ও সিন্দুরের ব্যবহার উপজাতীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও রীতি বলা যায়। ঋকবেদের স্তোত্র, প্রার্থনামন্ত্র, বশীকরণ, চালান, বানমারা ও কুশপৌত্তলিকা দাহন ইত্যাদি নৈসর্গিক ভাবে আপ্লুত মুণি ঋষিদের মানসিক প্রসূত। উপজাতীয় অচাই দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজা ও দেবদেবী আহ্বান বিদ্বেষণ বশীকরণ সম্মোহন বিদ্যাও ঋকবেদের একটি শাখা বিশেষ। একঅর্থে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী আদি হিন্দু ও হিন্দুদেরই একটি শাখা বিশেষ। উপজাতীয় জনগণ ধর্মান্তরিত হিন্দু নয়। কাহাকেও জোর করিয়া বা প্রলোভিত করিয়া হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত ও ধর্মান্তরিত করা হয়না। মহাদেব নিজেই পার্বত্য জাতি ও পর্বতের আদিবাসী। মহাদেবের সহধর্মিনী পার্বতী। উপজাতীর মানসিক গুণ, সরলতা, সত্যবাদিতা- সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম এই প্রতিধ্বনির প্রতিফলন। কোন কোন পৌরাণিক গ্রন্থে মহাদেবকে কীরাট রূপে ভাবিত হইয়াছে, পার্বতী কিরাট রমণী। কালী ও দূর্গা পূজায় সিন্দুর অপরিহার্য্য উপাদান ও সিন্দুর যৌন ভোগেব প্রতীক। যাহার কপালে সিন্দুর নাই সেই রমণী যৌন সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত। উপজাতি সমাজে সামাজিকস্তরে মদ্যপান প্রচলিত থাকাতে, বংশ পরম্পরায় মদ্যপানে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। অতিরিক্ত মদ্যপান সুচিন্তা ও গঠনমূলক

পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধক স্বরূপ। নিরক্ষরতা, মহাজনদের শোষণ ও প্রশাসনিক মারপ্যাঁচ, কুটকৌশল ইত্যাদি উপজাতীয় সমাজ বিকাশে, উন্নততর সভ্যতায় উত্তরণে প্রতিবন্ধক হইয়া আছে। সর্বোপরি রুচি ও মনোবৃত্তি বা মানসিক গুণ পরিবর্ত্তনের অভাবে এই সমাজ অনগ্রসর।

প্রতি পূজায় পূজার আসনে দেবতাকে মদ্য উৎসর্গ করার বিধি আছে। উৎসবে ভোজে, বিবাহে, অতিথি আপ্যায়নে প্রচুর মদ্য পান করা হয়। সমস্ত উপজাতির বিশ্বাস, দেবদেবী কল্পনা প্রায় এক। মঙ্গলকারী দেবতার চেয়ে অমঙ্গলকারী দেবদেবীর পূজা- অর্চনা, ভূত-প্রেত, বিতাড়নের আনুষ্ঠানিক পূজা ও মন্ত্র তন্ত্রের ব্যবহারই বেশী। অপদেবতার হাত হইতে রক্ষার জন্য যাদুমন্ত্র প্রয়োগই বেশী।

৫। অপদেবতার নাম ও তাহাদের প্রতি ধারণা:

পূর্বে অনেক দেবতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি দেবদেবী অমঙ্গলকারী ও রোগ সৃষ্টিকারী বলিয়া বিশ্বাস। যাদু ও মন্ত্রের সাহায্যে এইসব অপদেবতাকে বিতাড়ন, মুদ্রা বন্ধন ও পূজায় জীব বলি দিয়া সন্তোষ সাধনের ব্যবস্থা আছে। এইসব ক্রিয়াকান্ড অচাই করিয়া থাকে। অপদেবতার মধ্যে প্রধান দেবতা হইল বুড়াছা ও তাহার পত্নী হাচুকমা। কালেয়া কলেয়া, যমদগা, রণদগা, দারোখা, রাওখাল, গলাবেং, গালাবেং, নাইরং, কালাকতর, বণিরক থুবনাইরক শি জি মাংসি, মংগিনী খাংগিনী ইত্যাদি। এইসব অপদেবতাকে রোগমুক্তির কামনায় বনে লোকালয়ের বাহিরে পূজা করা হয়। পূজায় প্রদত্ত কোন দ্রব্য বাড়ীতে নিয়া আসা নিষেধ। বধ্যজীবের মাংসাদি পূজাস্থলে বনে রন্ধন করিয়া ভোজন করা হয়। যেমন, বুড়াছা পূজা, বণিরক পূজা ও খোওয়া পূজা সেটাও বনের পূজা। এই পূজাকে মাথা ধোয়া বা শুদ্ধ করাও বলা হয়। কাহাকে বাঘে বধ করিলে গোষ্ঠীর 'সান্দাই' লাইনে খোওয়া পূজা করিতে হয়। সান্দাই হইল বংশের পুরুষ লাইনের সম্পর্ক। মেয়ের লাইনে নহে। পুত্র প্রপৌত্র এইরূপ পুরুষ বংশক্রম সম্পর্ককে 'সান্দাই' বলে। কোন ব্যক্তিকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া বধ করিলে তাহার বংশের সান্দাই অর্থাৎ পুরুষ ক্রমে প্রত্যেক পরিবারই খোওয়া পূজা দিতে হয়। খোওয়া পূজা কোন স্রোতস্বিনী ছড়া বা নদীতে দেওয়া হয়। ঐ পূজায় মোরগ বলি দেওয়ার পর একটা হাঁস বা পাঁঠা মুখে কাপড় বাঁধিয়া বাঘের নামে

বনে রাখিয়া আসিতে হয়। এই আচরণকে 'বল্লাই' বলা হয়। কোন পূজায় হাঁস বল্লাই, কোন পূজায় ছাগ বল্লাই দেওয়া হয়। এইরূপ পূজার ফলস্বরূপ সে বংশে ভবিষ্যতে আর বাঘে কোন ব্যক্তিকে বধ করিবেনা এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত।

বুড়াছা অপদেবতার প্রধান দেবতা:

বুড়াছা অপদেবতার প্রধান দেবতা। বনে উপবনে, বাদুর বাস গুহায়, নদী উপনদী যাবতীয় দোষযুক্ত স্থানে বুড়াছা দেবতা অধিষ্ঠান করে বলিয়া অচাইদের বিশ্বাস। বুড়াছার স্বরূপ নাকি একশত বিশ প্রকার। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় বুড়াছা মানুষের উপর ভর করিয়া 'ছিলি' অর্থাৎ দৃষ্টি করে বলিয়া কথিত। এইসব কারণে গর্ভবতী শিশু ও ভয়ার্ত ব্যক্তিকে ঐসব সময়ে বনে, ঘাটে যাইতে নিষেধ করা হয়। যেসব স্থানে হরিণ -বানর আরো অন্যান্য জীবজন্তুর প্রাণপাত হয় ঐ স্থানকে বুড়াছা দৃষ্টিযুক্ত দূষিত স্থান বলিয়া ধরা হয়। কাহারো রোগ হইলে অচাই বলিয়া দেয় ঐ সব দূষিত স্থানের সন্ধান এবং রোগ নিরাময়ের জন্য অচাই ক্রিয়াদি করিয়া থাকে।

বুড়াছার অন্যরূপ কালাকতর। এই কালাকতর জলে অধিষ্ঠান করিলে নাইরাং দেবতা নামে নিশীতে পূজিত হয়। এই কালাকতর মস্তকবিহীন এবং দুই কাঁধ অতিশয় উঁচ্চ ও বক্ষ সুভীষণ, দন্তময় বলিয়া কল্পিত। কালকতর সপ্ত ডাইনীর নিত্য সহচর বলিয়া কথিত। সপ্ত ডাইনীর নাম (১) সাজাবী, (২) হাজাবি, (৩) হাম্বারী, (৪) বাবারী, (৫) শ্লোকতুই, (৬) ম্লোকতুই, (৭) ফোঁচিলী। এই সপ্ত ডাইনীই বনের ছেকাল বলিয়া কথিত। এই সপ্ত ডাইনীর পূজার বিধান ও মন্ত্র আছে। যাহারা এই সপ্ত ডাইনীকে হাজির করার বিশেষ মন্ত্র জানে তাহারা মানব হইয়াও ছেকাল হয় বলিয়া সমাজে পরিচিত। স্ত্রীলোক ছেকাল মন্ত্র শিখিয়া ডাইনীর আচরণ করে বলিয়া কথিত। ছেকাল নাকি রাত্রে চিল, পেঁচা, ঔয়াং দুধুমা রূপ ধরিয়া, পক্ষীরূপে বিচরণ করে। ছেকাল নাকি রাত্রে মশালের ন্যায় জ্বলে ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারো বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়ী ও ঘুমন্ত লোকের শরীর হইতে রক্ত চুষিয়া পান করে। ছেকাল নাকি শয্যাগত রোগীর উপর আসক্ত হয় ও রোগ বৃদ্ধি করে, চক্ষু উপড়িয়া খায়, ক্ষতস্থান চুষিয়া যন্ত্রণা বাড়ায় ও রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলে। ছেকাল দৃষ্টি পতিত হইলে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। এই ধারণায় ছেকাল বলিয়া সন্দেহকৃত রমণীর উপর রোগীর আত্মীয় কুটুম্বের রোষ ও ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। কখন কখন এইরূপ

সন্দেহ ভাজন স্ত্রীলোককে সুযোগ পাইলে হত্যাও করে। এই ধারণা অদ্যাবধি আছে, এখনও ঐসব ধারণা তিরোহিত করা সম্ভব হয় নাই। ঐসব ধারণা এখনও জ্বলন্ত ও প্রত্যক্ষ হিসাবে সমাজমনে গভীর চেতনায়, অবচেতনায় জুড়িয়া আছে। বংশপরম্পরায় উপজাতি জনমানসে ছেকাল সম্পর্কীয় নানা মুখরোচক গল্প কথকদের ও ঠাকুরমার মুখে অতি শৈশবকাল হইতে শুনিতে শুনিতে ছেকালের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে মনের কোণে এক ধরনের ধারনা বা বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়। এই ধরণের ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) বার বছরের নিম্ন বয়স্ক দুই বালিকা দুই পরিবারের সন্তান হইলেও প্রায় সময় একসংগে চলাফেরা ও এক বিছানায় ঘুমাইত। তাদের মধ্যে এক বালিকা ছেকাল পরিবার ভুক্ত এবং ছেকাল মন্ত্র জানিত ও নানা মায়া জানিত। অ-ছেকাল বালিকাকে সে কখনও পক্ষীরূপ ধরাইত, কখনও একটি পাগড়ী মন্ত্রপুত করিয়া গভীর নিশীথে ঐ বালিকাকে সহচরী হিসাবে ছেকাল উচ্ছিষ্ট শিকারে লইয়া যাইত। একদিন ঐ বালিকাটির মন্ত্রপুত পাগড়ী মাথা হইতে খসিয়া পড়াতে সে সাধারণ মানুষ হইয়া যায়, ফলে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পতিত স্থানে অন্ধকারে ভয়ে চিৎকার করিতে থাকে। তখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকজন জানিতে পারিয়া তাহাকে উদ্ধার করে ও তাহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার পিতা তখন তাহাকে ছেকাল সম্মোহিত অবস্থা হইতে স্বাভাবিক করার জন্য শামুকের সাতটা খোল খেলিতে দিয়া সুস্থ অবস্থায় ফিরাইয়া আনে।

(২) কোনও গ্রামের এক যুবতীকে অন্যগ্রামে বিবাহ দিয়া বধু হিসাবে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠানো হয়। ঐ যুবতী নাকি ছেকাল পরিবারের, কারণ তাহার মা ছেকাল মন্ত্র জানিত এবং শ্রেষ্ঠ ছেকাল ছিল। কালক্রমে যুবতী শ্বশুর বাড়ীতে গর্ভবতী হইলে নরমাংস খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। তখন সে তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিল যে তুমি মায়ের নিকট যাও - একটা গর্ভস্থ কলার মোচা লইয়া এসো। তখন তাহার স্বামী শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীর গর্ভাবস্থার কথা ও কলার মোচা খাওয়ার প্রবল আগ্রহের কথা জানাইলে তাহার শ্বাশুরী মন্ত্রে সেই গ্রামের এক রমণীর গর্ভপাত করাইয়া গর্ভস্থ শিশুকে দেহ নাভী ও অন্যান্য দেহের অংশ সহ মন্ত্রে কলারমোচা করিয়া একটা নতুন পাতিলে ঢুকাইয়া মুখ বদ্ধ অবস্থায় জামাতার হাতে তুলিয়া দেয়। পরের দিন তাহাকে ভাত তরকারি কলার পাতায় বাঁধিয়া দিয়া, বলিল পথে ক্ষুধা হইলে নদী পার হইয়া এসব খাদ্য খাইও। জামাতা প্রত্যুষে গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

পথে আসিতে আসিতে একটা ছোট নদীর তীরে আসিয়া পড়িল। তখন বেলা প্রায় দুপুর হয় হয়। যুবকটি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর। তখন সে নদী পার না হইয়া একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিল। তারপর চোঙা দিয়া নদীর জল তুলিয়া ছায়ায় বসিয়া শ্বাশুড়ির দেওয়া খাদ্য খাইতে উদ্যত হইল। ঐ পাতায় বাঁধা খাদ্য, পাতিলে বাঁধা খাদ্য একে একে খুলিয়া দেখিল। যুবকটি ঐসব দ্রব্যাদি খুলিতেই দেখিল যাহা তরকারী দেওয়া হইয়াছিল উহা শূকরের বিষ্ঠা, পাতিলের ভিতরে একটা সুন্দর শিশু নাভিসহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দেহাংশসহ নড়াচড়া করিয়া হাত পা নাড়িতেছে। যুবকটি এ দৃশ্যে অবাক হইল ও স্ত্রীকে ছেকাল বলিয়া বুঝিতে পারিল। তখন বৃক্ষছায়ায় ক্লান্তি দূর হওয়ারপর ঐসব দ্রব্যাদি লইয়া নদী পার হইয়া আসিল ও পূর্ববৎ খুলিয়া দেখিল। যুবকটি নদীর এপারে আসিয়া দেখিল উত্তমরূপে তৈয়ারী শূকর মাংসের তরকারী ও হাড়ির ভিতর কদলী গর্ভস্থ সুন্দর এক কলার মোচা। যুবকটি ঐ দৃশ্যে অবাক বিস্মিত হইল এবং তাতে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণাভাব উপস্থিল হইল। মনে করিল সে কিরূপ ভয়ঙ্কর স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছে। ঘরে আসিয়া সে তাহার স্ত্রীকে বলিল শ্বাশুরী কিছু পাঠায় নাই। তোমাকে এসব দ্রব্যাদির জন্য স্বয়ং বাপের বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছে এই বলিয়া স্ত্রীকে চিরতরে বিদায় দিয়াছিল।

বনে বিচরণকারী সপ্ত ডাইনীর নাম পূর্বে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ছয় ছেকাল নাকি আসল বনচারিণী ডাকিনী। ফোঁচিলী ছিল নাকি মানবী। একদিন ফোঁচিলী নামে মানবী নাকি বনজ খাদ্য আহরণে বনে গিয়াছিল। ঐ বনে ছয়জন পিচাশিনী মানবী রূপ ধরিয়া ফোঁচিলীকে দেখা দিল। মায়া করিয়া তাহাদের অপরূপ সজ্জিত বাড়ীতে লইয়া গিয়া খাদ্য পানীয় দিয়া সস্নেহ আচরণে তাহাকে অতিশয় মুগ্ধ করেছিল। বিদায়কালে তাহাকে একটি চারি আঙ্গুল পরিমিত বাঁশের চোঁঙায় একটা প্রকান্ড হরিণের পিছনের পা ঢুকাইয়া উপহার দিয়াছিল। ডাইনীরা ঐ উপহার দেওয়ার কালে যুবতীকে বলিল তুমি পথে চোঁঙা খুলিওনা। খুলিলে বিপদ হইবে। কিন্তু ফোঁচিলী আসিতে আসিতে বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রামকালে এই দেওয়া চোঙাটি এত ভারী লাগে কেন এই ভাব হওয়াতে খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল ও খুলিয়া দেখিল। চোঙাটি মাটিতে সজোরে ঠেকাইতেই হরিণের প্রকান্ড পা বাহির হইল - সেই পা আর চোঙাতে চেষ্টা করিয়াও ঢুকাইতে পারিলনা। দীর্ঘ সময় গলদঘর্ম হইয়া হরিণের পা চোঙাতে ঢুকাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু বিফল হইল। হরিণের প্রকান্ড পা,

মন্ত্র শক্তিতে ছোট চোঙাতে ঢুকানো হইয়াছিল উহা মন্ত্র ছাড়া আর ঐ চোঙাতে ঢুকানো সম্ভব নহে জানিতে পারিয়া ও ডাইনীদের মধুর সস্নেহ আচরণে মুগ্ধা যুবতী আবার তাহাদের সহচরী হিসাবে বনে ফিরিয়া গেল - চিরদিন তাহাদের সঙ্গ ছাড়িলনা। এই চোঙায় মাংস ঢুকানোর মন্ত্র পরে মানব কুলে প্রচারিত হয়। যাহারা এই মন্ত্র জানে তাহারা মানুষের পেটে মাংস ঢুকাইতে পারে এই বিশ্বাস পাহাড়ী সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে।

ছেকালের যাদুমন্ত্রের ক্রিয়াকরণ যে রমণী জানে সেই রমনীকে বলা হয় ছেকালজুক। সেইরূপ মন্ত্র জানা পুরুষকে বলা হয় বেদু-ওয়া। ছেকালজুক নাকি প্রায় সময় রাত্রে মশালের মতো আলোকিত হইয়া জ্বলে ও রক্ত লোলুপ আগ্রহে রোগী ও নিদ্রিত ব্যক্তির সন্ধানে বিচরণ করে। কিন্তু বেদুওয়া ভাদ্রমাসে অমাবস্যায় সংবৎসরে একবার নাকি জ্বলে। মানবী ছেকালজুক মন্ত্রশক্তিতে আবিষ্ট হইয়া নিশীথে বিচরণে উদ্যোগী হইলে শুধু তাহার মস্তক ও সংগে নাড়ীভুড়ির অংশ চলিয়া যায় দেহের অবশিষ্ট অংশ নাকি পড়িয়া থাকে। তাই ছেকালজুক যাহা খায় তাহা তাহার উদরে পূরণ হয়না - খাদ্যবস্তু মায়া বলে বন্য ডাইনীদের ভোগে লাগে। মোটকথা বনের ডাইনী মানবী ডাইনীর সহায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে ও উদরে পূরণ করে। যতই ছেকালজুকের সংখ্যা বাড়ে ততই বনডাইনীদের আহার সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ে ও ভোগবৃদ্ধি পায়। এইজন্য নাকি ছেকাল জুকের সংখ্যা বাড়াইতে তাহারা সতত আগ্রহী। ডাইন, পিশাচ বা ছেকাল মানে সর্বদা প্রবল ক্ষুধার্ত্ত ও আহারে তৃপ্তিহীন জীবকে বুঝায়। কোন ব্যক্তি খাদ্য সামগ্রীর উপর অতিশয় লোভ ও আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে তাহাকে ছেকালের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। মানবী ডাইনী নাকি মানব ছেকাল সংখ্যা বাড়াইতে আগ্রহী। সারা বৎসর প্রচার কার্য্যে নাকি ডাইনী সকল ব্যস্ততায় ও মন্ত্রণায় থাকে। বন্য ডাইনীদের বুখুকছিনিও বলা হয়। ইহার বঙ্গার্থ সপ্তভগিনী।

পুরুষ ছেকালকে বলা হয় বেদুওয়া। এই বেদুওয়া ছেকাল রমণীগণের রাজা। তাহাকে অন্যান্য ছেকাল ভয় করে ও তাহার আদেশ নাকি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

রোগ নিরাময়ের জন্য ও ছেকালের কোপদৃষ্টি এড়াইবার জন্য নানা প্রকার ছেকাল পূজা প্রচলিত। তাহার মধ্যে (ক) মেলা, (খ) দাইগুং, হমুখু, (গ) নকখুঙছিনি, (ঘ) সাজানি মাফা, (ঙ) হজানি মাফা, (চ) সাকচড়াই, (ছ) নকখু, (ঝ) চুম্লাই পূজা আচরণই প্রধান। এইসব পূজায় শূকর, কচ্ছপ,

মোরগ, কবুতর, হাঁস প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। মদ, বুতুক গড়া, খই, পিষ্টক, রান্না ভাত, কলা চিনি বাতাসা প্রভৃতি ভোজ্যবস্তু উৎসর্গ করা হয়। এসব পূজায় বলি শূকরের মাথা নাকি বেদুওয়া মন্ত্রবলে অদৃশ্য উপায়ে হরণ করিয়া অন্যত্র নিয়া যায় ও আহার করে।

ভাদ্র মাসের অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে ছেকালদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ছেকালদের সাড়া বৎসরের লোকের অনিষ্ট জনক ক্রিয়াকান্ডের হিসাব, ছেকাল সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব ও ভবিষ্যৎ করণীয় কর্মাদির বিবরণ নাকি আলোচিত হয়। বেদুওয়াকে সপ্ত ডাইনী সাতমাথার চুলের দোলায় দুলাইয়া সসম্মানে সভায় আনিতে হয়। তথায় সকলের খই খাইতে পায় সেই খইয়ের আকার নাকি চালতা ফলের সমান।

যেসব পূজা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিবছর আমরণ কোন ব্যক্তিকে অমঙ্গল আশঙ্কায় অনুষ্ঠান চালাইয়া যাইতে হয় এরূপ পূজাকে 'সাকচরাই' পূজা বলে, ইহা যাবৎ জীবং বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠেয় ব্যক্তিগত পূজা। সাকচরাই পূজা ব্যক্তি বিশেষের যেকোন দেবতার পূজা হইতে পারে। যেমন কালী পূজা, বুড়াছা পূজা, গড়েইয়া পূজা ইত্যাদি সাকচরাই বা সাকপ্লাই পূজা বলে।

বনিরক, থুবনাইরক - এই দেবতাদের ভয়ঙ্কর ও সংহারক দেবগণরূপে গণ্য করা হয়। জ্বর হইল, হঠাৎ মৃত্যু হইলে, হঠাৎ অবশ শরীর হইয়া ঢলিয়া পড়িলে থুবনাইরক, বনিরক দেবতার হাওয়া লাগিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদের পূজা লোকালয়ের দূরে বনে দেওয়া হয়। রোগ মুক্তির কামনায় কবচ দেওয়ার বিধান আছে।

এইসব দেবদেবী ও অপদেবতা বিশ্বাস ভাব ও কল্পনায় উপজাতিদের ধর্মের প্রাচীনরূপের ভাবধারা বলিয়া অনুমান করা যায়। বহু প্রকারের অলৌকিক ভাব ও কল্পনা মৌখিক ও অলিখিতকারে সাহিত্যকে রসসিক্ত ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। উপজাতীয় লোক সম্প্রদায় ইহকাল- পরকাল, কীট পতঙ্গ, সৃষ্টি রহস্য, চন্দ্র সূর্য্য, তারকা, তরুলতার সহিত মানবের সম্পর্ক ইত্যাদি বহু ভাব ও কল্পনা করিয়াছে যাহা রূপকথা উপকথায় ঐসব ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পশু পাখীকে নায়ক করে গল্প রচনা করিয়াছে, এই ভাব ও কল্পনা মৃত্যুর পরপার পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই ভাব ও কল্পনা ক্রমে ক্রমে হিন্দুশাস্ত্রের উৎস হিসাবে বেদ ও পৌরাণিক কাহিনীর ভাবধারাকে উপাদান যোগাইয়াছে ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠিকে পঞ্চমবর্ণ কীরাট বা নিষাদ বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। উপজাতীয় ভাবধারাই হিন্দুধর্মের মূল উপাদান। মূলত:

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীই ভারতের আদিবাসী। আদিবাসীর ধর্মই ভারতের প্রাচীন ধর্ম। সুব্রাই বা শিব ভারতের আদি দেবতা ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অধিকর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত। পরবর্ত্তী কালে হয়ত কোন বহিরাগত জনগোষ্ঠি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু - দুই দেবতার কল্পনা করিয়া শিব হইতে শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপন করেন এবং এ জনগোষ্ঠী আদিবাসী হইতে বুদ্ধিমান ও উন্নত হওয়াতে শৈব ধর্মভুক্ত জনগোষ্ঠিকে ম্লান করে এবং সংগে সংগে আদিবাসীর শ্রেষ্ঠ দেবতা শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু হইতে কনিষ্ঠ এই আসনে স্থাপিত হয়। কোন জনগোষ্ঠীকে মানসিকগত, আচারগত ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিতে হইলে তাহার সংস্কৃতি ও শ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতাকে অধম স্থানে আসীন করিতে হয়।

সর্বপ্রাণবাদ হিন্দু ধর্মের মূল উৎস। যাহা আদিবাসী জন মানসের কল্পনা প্রসূত। সুতরাং আদিবাসী, পার্বত্য জনগণই আদি হিন্দু। গৃহেঠাকুরেরআসনে মাইলুংমা, খুলুংমা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্ত্তমান কালে দুইটি মাটির হাঁড়ি চাউল পূর্ণ করিয়া বসানো হয়। সেটিই মাইলুংমা ও খুলুংমার প্রতীক। মিলিত নাম 'রণদক'। রণদকে শালগ্রাম সদৃশ দুইটি পাথর স্বামী-স্ত্রী জ্ঞানে রাখা হয়। এই পাথর বংশ বিস্তার করে বলিয়া রংদক পূজারীদের বিশ্বাস। উচ্চতর হিন্দু ধর্মাচরণে শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠদেব ভগবান বলিয়া পূজা করা হয়। এইসব আচরণই আদিম ধর্ম বিশ্বাসের ও সর্বপ্রাণবাদের উদাহরণ। রণদকের পাশে গৃহকোণে দেবী নকসু মতাই পূজিত হয়। এই দেবীর নাম বিনাইগশ্বরী। সপ্ত ডাইনী ও বুড়াছা ঐ আসনে বিরাজ করে বলিয়া বিশ্বাস। রণদকে রাখা পাথরের নাম খড়ি। ত্রিপুরী ও ককবরক ভাষী উপজাতী সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে রণদক ও খড়ি পূজিত হইয়া আসিতেছে। এইসব দেবদেবী মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইই করিতে পারে। আর একটি দেবীর নাম সাংগ্রংমা। এই দেবী পাক্ষী, হাতী ও বাহনের দেবী বলিয়া কথিত। হাচুকমা বুড়াছার পত্নী। এই দেবী বনের পশুপক্ষীকে রক্ষা করে বলিয়া কল্পিত। পূর্বেও তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। আদিবাসী জনগণের বাসস্থান, ভৌগলিক পরিবেশ ও ইহার প্রভাব

যেসব জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর যে যে অংশে আদিকাল হইতে উৎপন্ন হইয়া সেইসব স্থানে বসবাস শুরু করেছিল এবং প্রকৃতি ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল, অনগ্রসর ঐসব জনগোষ্ঠীকেই আদিবাসী বলে। পৃথিবীর সর্বত্রই আদিবাসী নামে অনুন্নত মানবগোষ্ঠী বাস করে। ভারতের

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এশিয়া মহাদেশে মঙ্গোলীয় জাতি লোকজনই অধিক, আদিবাসী জনগণ নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। নেপাল, ভূটান, সিকিম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে হিমালয় পর্বতের শাখা প্রশাখার পর্বত শ্রেণীতে প্রচুর পার্বত্য জাতি বাস করে। ত্রিপুরা রাজ্য এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এই অঞ্চলে খুব বেশী। এইসব কারণে এই অঞ্চলে গাছপালা অল্প সময়ে বৃদ্ধি পায় ও গভীর বনাঞ্চল দেখা যায়। আদিবাসীগণ বনজ সম্পদে নির্ভরশীল বলিয়া শিল্প বাণিজ্যে অনগ্রসর। ষাট বছর পূর্বেও জনবসতি বিরল ছিল, যানবাহনের উপযুক্ত স্থায়ী রাস্তাঘাট ছিলনা। হাতী ও ছোট নৌকা পরিবহণের অন্যতম মাধ্যম ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতি অল্প ছিল, তাই ত্রিপুরাবাসী পার্বত্য জনসমাজে শিক্ষার প্রসার অতি নগণ্য ছিল। তথাপি জনগণ অশিক্ষিত ছিলনা। প্রধান জীবিকা জুমকে কেন্দ্র করিয়া নাচ-গান, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্ম,দর্শন, সংস্কৃতি, সামাজিক ও মানবিকতার সকল গুন ধীরে ধীরে বিকাশ হইয়াছিল। মুখে মুখে প্রচলিত রূপকথা, উপকথা ও সামাজিক চেতনাদি ও শৃঙ্খলাবোধ উপলব্ধি করিয়া তাহারা যে অশিক্ষিত ছিলনা এই কথা বলা যায়।

গভীর বনাঞ্চলে পর্বতের স্থানে স্থানে পার্বত্য পল্লী। আত্মরক্ষার সুবিধার্থে বা সামাজিক কারণে দশ পাঁচ পরিবার একত্রে বসবাস করে। ঐসব গ্রাম পঞ্চাশ ষাট বছরও স্থায়ী হয়। যার যার সুবিধা অনুযায়ী পাশাপাশি বা দূরে দূরে ছড়াইয়া জুম চাষ করে। জুম মরশুম বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত। এই সময় তাহারা জুমে বাস করে ও জুম কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। ধান্য ফসল মাড়াইয়া ঘরে তোলা হইলে টং ঘরে গোলাজাত করা হয়। ফসল গোলাজাত করার পর সমস্ত ধান লাঙ্গাতে করিয়া পিঠে বহন করিয়া পূর্ব বাসস্থান পল্লীতে নিয়া আসা হয়। তখন ছয়মাস ঘর ছাড়িয়া জুমে বাস করাতে গ্রামের বাঁশ ও ছনের তৈয়ারী কুটির প্রায় নষ্ট হইয়া যায়, সেই কুটির আবার মেরামত করিতে হয়। অবশ্য বনে প্রচুর ছন, বাঁশ গাছ থাকাতে বিনামূল্যে কুটির নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করা যায়। অতি অল্প সময়ে নতুন কুটির নির্মাণ করে বা পুরাতন কুটির মেরামত করিতে পারে। বনে ফলমূল, কন্দ, লতাপাতা, শাকসব্জী সংগ্রহ করিয়া টাটকা ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণযুক্ত আহার্য্য সংগৃহীত হয়। জুমের চাউল, শাকসব্জী, মশলা, তামাক, নানাবিধ ফল

যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা মিটিয়া যায়। প্রয়োজনীয় আসবাব ও সাজসরঞ্জাম বনজ বাঁশ ও গাছ হইতে তৈয়ারী করা হয়। বেতের নানাবিধ ফসলাধার হাতে বুনা হয়। লাঙ্গা, বসার মাদুর, হাত পাখা, কাপড় চোপড় রাখার জাবা, নখাই, চেমাই, খুত্রুক, কচা য়াংখুং ইত্যাদি বাঁশ বেতের প্রয়োজনীয় আসবাব ও বাঁশের বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়। যেমন, বাঁশের শিঙ্গা, দংদ্রংমা, দাংদু ইত্যাদি। বাঁশের চিরুণীতে উত্তমভাবে চুল আচড়ান যায়। জুমের তিল হইতে তৈল প্রস্তুত করা হয়। হলুদ, আদা, লঙ্কা, জুইন ও মসলা জাতীয় সুগন্ধ উদ্ভিদ তরকারীতে মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যাহা জুমে সহজে উৎপন্ন হয়।

বনের গাছ গাছড়ার শিকড় ও চাউলের পিষ্টক মিশাইয়া ভাত পচানোর জন্যে ঔষধ 'চুওয়ান' প্রস্তুত হয়। চুওয়ান দ্বারা মদ্য প্রস্তুত হয়। গ্রামের কর্মক্ষম স্ত্রী পুরুষ দলবদ্ধভাবে একে অন্যের জুমক্ষেত্রে পাল্টাপাল্টিভাবে কাজ করে। এ দল একজনের জুমের পর অন্যের জুমে ক্রমান্বয়ে কাজ করিয়া যায়। আজ এক ব্যক্তির কাজ করে, পরদিন দলবদ্ধভাবে অন্য ব্যক্তির জুমে কাজ করে। এই মিলিত ব্যক্তিগণ মদ্যপান করিয়া নাচিয়া-গাহিয়া চিত্ত বিনোদন সহ কাজ করে। এইরূপ পরস্পর সহযোগিতা ও সাহচর্য্যে, শ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া যায়, আনন্দঘন রসে কর্মচঞ্চল মুহুর্ত্ত অতিবাহিত করে। দলবদ্ধ জনতা হিংস্র পশুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সাহস পায়। অসংখ্য পর্বতের আড়ালে, গভীর বনের কোলে, জুম ও জুমিয়া জীবন সহজ সরল অনাড়ম্বর পরিবেশে চিত্ত সুখে কাল অতিবাহিতকরে। কি জুমে কি পল্লীতে বাসপোযোগী 'টংঘর' নামক কুটির তৈয়ার করা হয়। টংঘর পর্বত চূড়ার সমতলে পর্বতের সমান্তরাল প্রস্থ হইতে দীর্ঘের পরিমাণ তিনগুণ -চারগুণ করিয়া মাচা বাঁধিয়া মাটি হইতে অতিউচ্চে তরজার মেঝে তৈয়ার করা হয়। মজবুত বেড়া মেঝের চারিদিকে থাকে। প্রস্থের উভয়দিকে বারান্দা থাকে, বারান্দার শেষ প্রান্ত সুদীর্ঘ একটা মাঝারী বা বড় আকারের গাছ বিছানো থাকে। ঐ কাষ্ঠ কান্ডে ঠেসদেওয়া উঠা নামার 'য়াখিল' বা সিড়ি রাখা হয়। ঐ মাচা ঘর একটি মাত্র বিরাট প্রকোষ্ঠ। এক পাশে থাকে এক বিরাট মাটি বিছানো রান্নার চুল্লী। যেখানে সর্বদা আগুন রাখা হয়। বাড়ীর উপরে পিছনের দিকে রাত্রে পায়খানা- প্রস্রাবের ব্যবস্থা থাকে। হিংস্র জন্তুর ভয়ে এই উচ্চ মাচা ঘর, ও এইসব ব্যবস্থা। পর্বতবাসী জনগণ সর্বদা পর্বত আরোহণ ও অবতরণ

করিতে হয়। এই জন্য তাহাদের পায়ের মাংসপেশী মাংসল ও মজবুত হয়। উঁচু নীচু উঠানামার সুবিধার জন্য মাথায় দড়ি লাগাইয়া লাংগা পিঠে রাখিয়া মাল বহন করে।

কার্ত্তিক -অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য ফসল কাটা ও মাড়া হইলে প্রায় জুমিয়া পরিবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসে। তখন জুম থাকে নিশব্দ-নির্জন। হিমেল হাওয়া, মৃদুমন্দ শীতল বায়ু বাঁশবনের মাথা নাড়িয়া প্রবাহিত হয়, নীল আকাশে হাল্কা মেঘ, কি অপূর্ব পরিবেশে শীতের সূচনার বোধ জাগায়। জুমের আশে পাশে, বৃক্ষের উচ্চ শাখা প্রশাখায় বানরগুলি অলসভাবে বসিয়া লেজ ঝুলাইয়া বাতাসে দুলিতে থাকে। পাখীর কলরবও শুনা যায়না। তখন পাতাগুলি প্রায় বিবর্ণ থাকে। যেন শীতের ভয়ে আকুল ও পাতাঝরা উৎসবের আয়োজনে ম্লান ও বিমর্ষ।

এই দেশে স্থায়ী রাস্তা ছিলনা, দুই পর্বতের মধ্যবর্ত্তী খাদ দিয়া ছোট ছোট ঝরণা প্রবাহমান ঝির ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ স্রোতস্বিনীতে মিলিত হয়। এইরূপে পর পর ক্রমশ: জলধারা বাড়িতে বাড়িতে বড় নদী সৃষ্টি হয়। পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য জলকুন্ড । একটি ঝরণার উজান বাহিয়া যাইতে যাইতে উৎসস্থলে উপনীত হওয়া যায়। বিভিন্ন ছড়া বা নদনদী ধরিয়া এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে পৌঁছানো যায়। যেইদিকে জুম সেদিকেই পথ। বনপথ খুবই সংকীর্ণ। স্রোতস্বিনীর উজানে বা নিম্নে অতিক্রম কালে অসংখ্য ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত নুড়ি ওপ্রস্তর খন্ড দেখা যায়। প্রস্তরখন্ডের পর প্রস্তর খন্ড অগণিত উপখন্ড কোনটি হলুদ কোনটি লাল বর্ণের। পিচ্ছিল প্রস্তর খন্ডের পর প্রস্তরখন্ড পাড়াইয়া একগ্রামের লোক অন্যগ্রামের লোকের সহিত যোগাযোগ করিতে হয়। ছোটছড়ার উভয় পাড়ে ঘন বৃক্ষের বন। কোথাও গভীর ও নিবিড় বৃক্ষের বন, কোথাও বাঁশবন। দুই পর্বতের মধ্যভাগে পাতার ছাউনীর নীচে কুলুকুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হয় স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী। উহার উভয় পাড় ঢালু। কোথাও দেওয়ালের ন্যায় প্রস্তর প্রাচীর। শাল, গর্জন, অশোক আরও কত কি বৃক্ষ সারিসারি দন্ডায়মান। রুদ্রাক্ষ ফল ঝড়িয়া হাঁটু জলে প্রচুর পরিমাণে ডুবিয়া থাকে। বৃক্ষ শাখায় নানা বর্ণের, নানা আকারের ফল । এই পাড়ের বৃক্ষশাখা ঐ পাড়ের বৃক্ষশাখার সাথে মিলিত হইয়া উভয় পাড়ে বৃক্ষশাখার পাতায় পাতায় - উপরিভাগ ছাউনী দ্বারা আবৃত, আকাশ দেখা যায় না। প্রখর রৌদ্র তথায় প্রবেশ করিতে পারেনা।

ঝরণার উভয় পাড়ে বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় কত রঙের ফল। কোন কোন ফল কাঠবিড়ালী ও পাখী খায়, কোন কোন ফল কোন প্রানী খায় না। এই ঘনবন ছায়া শীতল ও নির্জন। নির্জন হইলেও নীরব নহে। ফল ফুল লতাপাতার ঝোপঝাড় অপরূপ শোভায় শোভিত ও কীটপতঙ্গের একটানা বিচিত্রসুরে বন মুখরিত। বৃক্ষে বৃক্ষান্তরে বানর লাফালাফি করে। কোন বৃক্ষ ডালে কাঠবিড়ালী পিছনে লেজ উঁচু করিয়া দুই হাতে ফল খায়। উল্লুকের ডাক মানুষের চীৎকারের ন্যায় শুনা যায়। ছোট পার্বত্যনদীর উভয় পাড়ে ছোট ছোট তৃনগুল্মের ঘন বন। ঐসব তৃনগুল্মই রোগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কোন কোন স্থানে ঝরণার ধারা উচ্চস্থান হইতে নিচে পড়িয়া জলপ্রপাত সৃষ্টি করে। প্রখর রৌদ্রে এই গভীর বনের ভিতর দিয়া ছোট নদীর পথ ধরিয়া ছায়ায় ছায়ায় পথ চলিতে আরামদায়ক। ছোট বড় কাল পাথরের খন্ডগুলির ফাঁকে ফাঁকে ঝরণা ধারার লুকুচুরি খেলা, কুলুকুলু শব্দে প্রবাহিত। নির্জন অরণ্যের এই কুলুকুলু ধ্বনি যেন এক মর্মস্পর্শী ভাষা।

এই ঝরণায় এক পশলা বৃষ্টি হইলে কাঁকড়ার দল, ঝাঁকে ঝাঁকে আহারের সন্ধানে প্রকাশ্য দিবালোকে পাথরের নীচের বাসস্থান ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে। কত ধরা যায়। কাঁকড়ার দাঁড়ার শাঁস খাইতে অতি সুস্বাদু।

পাথরের তলে ঝরণার অগভীর জলে ছোট বড়শী ফেলা মাত্র মাছ সজোড়ে টানিয়া লইয়া বড়শীর ছিলে উঠিয়া আসে। পার্বত্য নদীতে মাছ ধরা বড়ই আনন্দদায়ক।

স্রোতস্বিনীর উভয় পাড়ে, কোথাও বন্য কদলীর বন, উহার নীচে মাটি ধ্বসিয়া লাল মাটি দেখা যাইতেছে, উর্ধে গগন স্পর্শী পর্বত চূড়ায় সারিসারি বনস্পতি। বৃক্ষ সমূহ নিথর নিঝুম মৌন অবস্থায় দন্ডায়মান। বিস্তীর্ণ বনময় অঞ্চল। এক গ্রাম হইতে অন্যগ্রাম কোথাও প্রায় পাঁচ মাইল, কোথাও প্রায় দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ঐসব অসংখ্য পর্বত গাত্রের ফাঁকে ফাঁকে রোমশ চামড়ার বিছানার মত সবুজ জুম দেখা যায়। ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জন মানবের কোন সাড়া শব্দ নাই। জুম করার জন্য বা গ্রাম বাঁধিয়া দল বদ্ধভাবে বনবাসের জন্য ঐ সব মাটির বন্দোবস্থ লইতে হয়না। কে বলে জুমিয়া ভূমিহীন। সাতমুড়া, সাতছড়া বিস্তীর্ণ এলাকা তার বিচরণ ক্ষেত্র। গাছ বাঁশ যত ইচ্ছা কাটিয়া আনিয়া গৃহ নির্মাণ বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়। কই কেহইত বাধা দেয় না। কেহইত চুরি করিয়াছে বলেনা। ব্যক্তি বিশেষের

মালিকানা স্থাপিত হইলেই অভাবের কারণে চৌর্য্য বৃত্তি শুরু হয়। ঘন বসতিপূর্ণ শহরে নিজের মালিকানার সীমার বাহিরে লতাপাতা, ফুল, ফল আহরণ করিলেই চোর বলিয়া গণ্য করা হয়।

জল যেইরূপ সুলভ, মাটিও সেইরূপ সুলভ। বসবাসের জন্য মাটি যে কিনিতে হয়, সেইটি একজন জুমিয়ার বিস্ময়ের বস্তু ও কল্পনাতীত। কারণ জন্মগত অধিকার হিসাবে পুরুষানুক্রমে জুমিয়া বায়ু, জল, সূর্য্যালোক, মাটি ও বনজ ফল মূল, বিনামুল্যে প্রকৃতির দান হিসাবে পাইয়া আসিতেছে। চারিদিকে সবুজ বনানী। তথায় জুমিয়া দম্পতি মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করে। সে এক অনাড়ম্বর সরলতা পূর্ণ স্বর্গীয় জীবন প্রণালী। তথায় মিথ্যা -প্রবঞ্চনা, ছল- চাতুরী, দেনা- পাওনার তীব্র হিসাব নিকাশ অচল ও ইহা তাহার কোমল হৃদয়ে স্পর্শও করেনা। তাহার প্রাণ উদার, শান্ত, সরল ও মধুময়।

এইরূপ পরিবেশে জুমিয়ার প্রাণ মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় অসীম আকাশে তলে, বিনা বাঁধায় স্বাচ্ছন্দে, বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করে। সীমাবদ্ধ ও গন্ডীবদ্ধ নিয়মাবর্ত্তী জীবন যাপনে জুমিয়া অনভ্যস্ত। তাই জুমিয়া পুনর্বাসনের মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পাদির প্রদেয়, নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ স্থানকে পিঞ্জরাবদ্ধ মনে করে ও উহা ত্যাগ করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গনে বাহির হইতে সে সচেষ্ট থাকে। শুধু আর্থিক অনুদানই যথেষ্ট নহে, তাহার রুচি শিক্ষার মাধ্যমে ও মানসিক পরিবর্ত্তন ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ভাবা উচিত। সুতরাং ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশুকে, শৈশব হইতে বর্তমান কালের উপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে রুচি ও প্রবৃত্তি গঠনে সহায়তা করিতে হইবে।

নদীই সভ্যতার জননী। যেকোন সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, সিন্ধু নদী তীরে সিন্ধু সভ্যতা ও ভারতীয় অন্যান্য নদীর তীরে বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। গাঙ্গেয় উপকূলবর্ত্তী আদিবাসী জনগণ অধিকতর প্রাচুর্য্যে বসবাস করে। কিন্তু বন্ধুর পর্বত সঙ্কুল, পার্বত্য প্রদেশে বা ঊষর মরুভূমিতে যাযাবর জাতীয় লোক দেখা যায়। প্রকৃতিই ইহার জন্য দায়ী। প্রকৃতির প্রতিকুল অবস্থাকে অনুকুল অবস্থায় আনয়নের মাধ্যমে আধুনিক জীবনধারণের মানসিক তাগিদ এখনও জুমিয়াদের আসেনি। সমভূমি জুম চাষের অনুপযোগী তাই অত্যুচ্চ পর্বতে বাস করে। অস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা বিধায় স্থায়ী রাস্তাঘাট, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি অর্থকরী বৃক্ষরোপণ করে না, যাহা উৎপাদিত হয় তাহা পরিবহণের ব্যবস্থা নাই। গাড়ী, ঘোড়া, যান বাহনের ব্যবস্থা নাই। আসামের বিস্তীর্ণ এলাকায় সুউচ্চ

পর্বতমালা বিস্তৃত, তথায় জুম প্রথা ছাড়া অন্য উপায় নাই! বর্ত্তমানে টেরিসিং প্রথায় ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা হইলেও ঐ প্রথায় উৎপাদনের পদ্ধতি জানা লোক সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নহে। সম্ভাব্য কৃষিকার্য্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, পশু পালন, পশম উৎপাদন, বাঁশ বেত, বস্ত্র উৎপাদনই পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নের উত্তম উপায়। বর্ত্তমানে ঐসব দেশে এবং ত্রিপুরায় যতটুকু শিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিজদেশে ঐ সব সম্ভাব্য ব্যবস্থা হইতে উপজাতীয় জনগণ দূরে সরিয়া রহিয়াছে। চিরাচরিত প্রথায় জুম চাষ ও অন্যান্য ব্যবস্থায় তাহারা সুদূর অতীত হইতে জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিয়াছিল ঐসব উপায় ও ব্যবস্থার উপযোগিতা ও সুবিধাও দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, তাই উপজাতীয় জনগণ দিনের পর দিন নি:স্ব নি:সম্বল হইয়া পড়িতেছে। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ আর্থিক ও রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক কৌশলের ফাঁদে শিকার হইয়া পড়িতেছে। এই সব জনগোষ্ঠীর আর্থিক আনুকূল্যের উপায়, শ্রমশক্তি, অবহেলিত ও নিম্ন মানের মর্য্যাদায় পর্যবসিত হইয়া পড়িতেছে। এইসব অপকৌশলের ফাঁদে পড়ার কারণ অশিক্ষা, সরলতা এবং মানসিক চেতনার অভাব, বংশগত ও সামাজিক সংস্কার রুচি ও অভ্যাসই দায়ী।

সুদূর অতীত হইতে কালপ্রবাহে, বর্তমানে মানুষ আধুনিক সভ্যতার প্রকৌশলে ও জীবনধারণে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। সেই নিবিড় অরণ্য, জনসংখ্যার অল্পতা, বনজ সম্পদের প্রাচুর্য্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, হিংস্র বন্যজন্তুর ভয়ভীতি, সরলতার স্থান ও সময় বর্তমানে আর নাই। জগত পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনের সংগে আচার অনুষ্ঠান, পূজা- অর্চ্চনা, পেশা, মানসিকতা, রুচি- প্রবৃত্তি সবকিছুই কালের সহিত সঙ্গতি ও সংহতি রাখিয়া ব্যক্তি বা জাতির মানসিক রুচিকে গঠন করিয়া লইতে হইবে। সুতীব্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদনের বর্ত্তমানের সহিত সমতালে চলিতে হইবে - তবেই আর্থিক সামাজিক অবস্থা বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইবে। সততা, সরলতা, প্রেম, লজ্জা, ঘৃণা, উদারতা প্রভৃতি মানসিক গুণাবলী মনুষ্যত্বের উপাদান। মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও মানবসুলভ আচরণই ধর্মের সোপান। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি যাহা নিজেকে ও অন্যকে নিম্নস্তরে, ঘোর দুঃখ-দুর্দশায় অবনমিত করে। সুতরাং মানসিক উৎকর্ষ ও গুণাবলী সহ সকলের বাঞ্ছিত কর্ম আচবণে চিরস্থায়ী পেশা নির্বাচন করিতে হইবে। অন্যের দুঃখদায়ক কর্ম ও আচরণে উপার্জনের প্রচেষ্টা, পাপ

পথে, ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। সুতরাং কালের বিবর্তনে পূর্বে উল্লেখিত দেবদেবীর কিছু পূজা অর্চনার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবে বর্জিত হইয়া আসিয়াছে। কারণ অতীতের সেই গভীরবন আর নাই, হিংস্র পশুর উপদ্রব ও আর নাই। সেই সব পূজাই বর্তমানে টিকিয়া থাকিবে যাহা স্বাভাবিক ও যৌক্তিকতার কারণেই উপযুক্ত। কারণ পরিবেশ ও মানসিক পরিবর্তনে ও কালের ব্যবধানে কোন কোন দুর্বল দেবতার দেবত্ব খসিয়া পড়িতে বাধ্য। বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে ঔষধাদি সেবনে রোগ, নিরাময় বা আরোগ্য হইলে, ব্যয়সাপেক্ষ পূজাদি বর্জিত হইতে বাধ্য। তাহাতে অপসংস্কৃতি দূরীভূত হইবে এবং তাহাতে সংস্কৃতির অঙ্গহানি হইবেনা। বরঞ্চ উচ্চ সংস্কৃতি গ্রহণে ও ধর্মের আশ্রয়ে উন্নততর হইবে।

বহু দেবদেবী পূজার প্রয়োজনীয়তা আছে। পূজার মাধ্যমে পার্বণ, পার্বণের মাধ্যমে উৎসব, আনন্দ ও জনসংযোগ হয় এবং পারস্পরিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। চিত্ত বিনোদন সুপ্রবৃত্তি জাগরণের সহায়ক হয়। শুধু রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনে, লোক চক্ষুর অন্তরালে অল্প সংখ্যক লোক বনে, উপবনে যে সব দেবতার পূজা করিয়া সন্তোষ সাধনে, ব্যক্তি বিশেষের রোগমুক্তির কামনায়, নিভৃত কুঞ্জে পানাহার করিতেছে - সেইসব দেবদেবী ও পূজারী উভয়েই স্বার্থপর। স্বার্থপরতা দেবত্ব নহে বরঞ্চ উহা নীচতার লক্ষন। তারজন্য কুলদেবতা সর্ব দেবদেবীর অধীশ্বর একমাত্র দেবাদি দেব মহাদেবের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক ও নির্দিষ্ট কালে সমবেত প্রার্থনার ব্যবস্থা করা উচিত, তাহাতে পারস্পরিক মিলনে প্রেম প্রীতি, উন্নত মানসিকতা, উদারতা, বদান্যতা সকল মানসিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিবে। হিংসা, জিঘাংসা, ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা কমিয়া যাইবে। সাধু সঙ্গ, সদ্ আচরণে সদ্ মানসিকতা গড়িয়া উঠিবে ও সৎ পেশা অবলম্বনে সৎপথের সন্ধান মিলিবে। যে ধর্মাচরণ যে নীতি ইহকালে কল্যানকর নহে তাহা কোন কালে উপকারী হইতে পারেনা। ঐহিক মঙ্গলজনক আচরণই পরকালের পাথেয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধিবলে করণীয় ও আচরণীয় পথ হিসাবে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিতে পারে। নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই একমাত্র পথ ও অবলম্বন। অতএব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া মন্দিরে সমবেত প্রার্থনা ও ধর্মালোচনা করাই মানসিক সৎগুণাবলী জাগরণে ও কুসংস্কার বর্জনের একমাত্র পথ। মনের ধীরতা, স্থিরতা সংস্কারের মাধ্যমে সাধিত না হইলে কোন মঙ্গলজনক কর্মে দৃঢ়তা ও গভীরতা আসিবে না। সৎ পেশায়, সৎকর্মে

উপযোগিতা অর্জিত হইবেনা। সুতরাং সৎ মানুষ প্রস্তুত করাই শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। সুশিক্ষায় শিক্ষিত মন, আদিম বন্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ভাব ধারায় মিলিত হইতে পারিবে। এইসব সংস্কার ও কর্ম, পূর্ব পুরুষের চিন্তা ভাবনার সহিত সম্পর্কযুক্ত ক্রমোন্নত আদর্শের দিকে সম্প্রসারিত করিয়া উদ্দেশ্যমুখী কর্মধারা সম্পাদন করিতে হইবে। ঐ কর্মধারা কাল প্রবাহে উপযোগিতা নিয়া নিরন্তর অবাধ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে। অন্যের প্রভাব মুক্ত হইতে হইবে। তবেই বিশুদ্ধ সমাজ সংস্কারের পথ নির্বাচিত হইবে ও অত্যুচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিবে। প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া নয়, প্রকৃতির পরিবেশকে আমাদের সমাজের উপযোগী করিতে হইবে।

খল লোক সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর। দুষ্ট লোককে সহসা সৎপথে আনা যায়না। কারণ মানুষের মানসিক গুণাবলী ও প্রবৃত্তি বংশগত ও জন্মগত। জন্মগত প্রবৃত্তিই সহজাত প্রবৃত্তি। সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষকে প্রতিভার অধিকারী করে। পক্ষান্তরে অহিত কর্মের দক্ষতার অধিকারী করে। সুতরাং সৎ ব্যক্তির সংখ্যা হইতে অজ্ঞ নির্বোধ অহিতকারী স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির আয়াসলব্ধ শক্তিতে বাড়িয়া উঠে। এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। সুতরাং একজন উত্তম ব্যক্তি, বহু অধম ব্যক্তির দ্বারা সৎকর্মে বাধা প্রাপ্ত হয়। বাধা অতিক্রম করাই মহত্ত্ব। যাহা সমাজে সংস্কারের পাথেয়।

৭) সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় দেবদ্বয়ের কাহিনী

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পরিগণিত হয়। সর্ব দেবদেবীর পূজার আগে এই দেবদ্বয়ের পূজা করিতে হয়। আমার প্রণীত তৈপুর সংহিতা নামক পুস্তকে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইষ্ট দেবদ্বয়ের রূপ

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় সদৃশ আকার।
পীত বর্ণ স্বল্প শ্মশ্রু, হয় চিরকুমার।।
নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব নাসিকা উন্নত।।
শুভ্র শিরস্ত্রাণ মাথে পশ্চাতে লম্বিত।।
উন্নত সুবক্ষ কুচ হয় লোম হীন।।
উদর লম্বিত নাভি হয় সুচিক্কণ।।
কাঁখেতে দুলিছে সূত্র, হাতে ধনুশর।।

নবীন সহাস্য মুখ, দুই দেববর।।
সুচিক্কণ কটি হয়, শরীর ত্রিকোণ।।
যুগ্ম চারু, রম্ভা ঊরু, হয় সুনিপুণ।।
আদর্শ পুরুষ রূপ, হয় রূপবান।।
অযোনি সম্ভবা দোঁহে, ভক্ত করে ধ্যান।।
দুই পদ মাংস যুক্ত, নহে স্থূলাকার।।
সুন্দর যুগল রূপ, সুন্দর আকার।।

(ত্রৈপুর সংহিতা)

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় পূজায় ওয়াথপকে দেবতার প্রতীক রূপে স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। পূজায় দুইটি মোরগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে। বনিরক, থুবনাই রক, কাথারক, ইখিত্রা বিখিত্রা প্রভৃতি দেব পূজায়ও ওয়াথপ স্থাপন করা হইয়া থাকে। ওয়াথপ প্রতীককে যুগ্ম দেবতা বলিয়া কথিত হয়। এই ওয়াথপ স্থাপিত পূজাকে লাম্প্রা বলে। লাম্প্রা মানে দুই পথের সন্ধিস্থল অর্থাৎ যুগ্ম দেবতা। দুই দেবের মিলন প্রতীক ওয়াথপ। যে কোন শুভ কার্য্যের সূচনায় লাম্প্রা ওয়াথপ পূজিত হয়। জুম কাটার সূচনায়, বিবাহে, যুদ্ধ যাত্রায়, লাম্প্রা পূজা দেওয়া হয়। বাঁশের তৈয়ারী প্রতীক সমূহে, ওয়াথপই প্রধান প্রতীক।

এইসব পার্বত্য দেবতা তান্ত্রিক অধিষ্ঠানের দেবতা। ভূত, প্রেত, ডাইন প্রভৃতি অশরীরি সত্ত্বা, ইহাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে কিন্তু দেহহীন অদৃশ্য। কিন্তু অন্যান্য পার্থিক জীবের ন্যায় তাহারা পৃথিবীতে বাস করে বলিয়া কল্পিত। তাহাদের সুখ দুঃখ পারিবারিক জীবন ও যৌন জীবন সব কিছু আছে বলিয়া মুখে মুখে বর্ণিত। তাহারা, যাদুবলে, দৈবশক্তি বলে মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগ সৃষ্টির যাদু শক্তিকে বলা হয় 'ছিলি' করা।
বনবাসী পার্বত্য জনগণের সহিত মিশিয়া, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকট হইয়া, ইহারা নিজেদের প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। এইসব দেবদেবী কোন ব্যক্তি বিশেষকে ভর করিয়া ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষের সংগে মিশিয়া তাহাদের আকার প্রকার পূজাবিধি মানুষকে শিক্ষা দিয়া এই দেবগণ পার্বত্য সমাজ জীবনে নিজ নিজ মর্য্যাদা ও স্থান করিয়া নিয়াছে। যাহাকে ভর করে তাহাকে দিয়ারী বলা হয়। দেবদেবীর পূজা অর্চনার বিধি, আচার, আচরণ ও বিধান, দেব চরিত্র, রুচি সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাইয়াছে ঐরূপ ব্যক্তিকে

অচাই বলে।

'ছেকাল' মানে ডাইন বা ডাকিনী। বিশেষত: স্ত্রীলোককে ছেকাল বলিয়া সন্দেহ করা হয়। মন্ত্র শিখিলে যেকোন রমণী ছেকালে পরিণত হইতে পারে এই ধারণা প্রত্যক্ষভাবে সকল ককবরক ভাষী জনগণ বিশ্বাস করে। ছেকাল রোগ সৃষ্টি করিতে পারে। মানুষের রক্ত চুষিয়া খায়, মানুষের উপর দৃষ্টি করে। ছেকাল পশুপক্ষীর রূপ ধরিতে পারে যেমন চিল, পেঁচা, বিড়াল, কুকুর হইতে পারে। কোন রোগীকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস ত্রিপুরী সমাজের প্রায় লোকই করে। সুতরাং দেব ধারণা প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত। এই ধারণা সকল পর্বতবাসী জনসমাজে প্রচলিত। কারণ দেব কল্পনার উৎস এক। চাকমা, মগ সমাজেও ঐ একই ধারণা ও বিশ্বাস প্রচলিত। পার্বত্য জনসমাজ আত্মা ও পুন:জন্ম বিশ্বাস করে। আত্মা দেহ ছাড়াও থাকিতে পারে, কিন্তু দেহ আত্মা ছাড়া থাকিতে পারেনা। ইহা ছাড়া নদী, বৃক্ষ, পর্বত, পাথর সকলের আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। মৃত আত্মাকে চেতনা সম্পন্ন জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও পূজা অর্চনা করে।

হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম জড়বাদ, সর্বপ্রানবাদ, জীবন্তবাদ এইসব পার্বত্য সমাজে উৎপন্ন হইয়াছে। মহাদেব সর্বদেবের দেব। তাহার বাসস্থান কৈলাস পর্বতে। গৌতম বুদ্ধের জন্ম হিমালয়ের পাদদেশে সুতরাং তাহারা সকলেই কিরাট জনগোষ্ঠীদ্ভব। ভারতের প্রচলিত আদি ধর্ম ও দেব কল্পনার জন্ম পার্বত্য জনসমাজে। এইসব মতবাদ কি ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের প্রয়োজন ও আবশ্যিক মনে করি। পার্বত্য সমাজ জীবন দারিদ্র্য পীড়িত সন্ন্যাস জীবনের কাছাকাছি। তাহাদের ধন লিপ্সা ও ঐহিক ভোগের লালসা কম দেখা যায়। তাহারা দরিদ্র কিন্তু মহৎ।

দেবতাকে প্রাণবন্ত মনে করে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভের জন্য পূজা করিতে করিতে ক্রমে জীবন্ত মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করার মনোবৃত্তিই অবতার বাদ। যাহা হিন্দুধর্মে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এই মনোবৃত্তি ত্রিপুরী সমাজেও দেখা যায়। যেমন অচাই। যে যাদুতুনা, অপদেবতা বিতাড়নের কৌশল জানে, দেবতার ইচ্ছা ও মনোভাব পূজায় উদ্ভুত ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে, এইরূপ দেবতার প্রতিনিধিই অচাই। যাহাকে দেবতা ভর করে ও মোহগ্রস্থ হইয়া অচেতন মনে শুভাশুভ ব্যক্ত করে; এইসব ব্যক্তিকে দেবাচারে ফুল চন্দন, ধূপ দীপ দিয়া পবিত্র আচরণে ভক্তি করা হয়, এইসব আচরণই অবতারবাদের প্রথম সোপান।

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় নামে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন গ্রামে দরিদ্র দম্পতির গৃহে দুই ভাই জন্ম গ্রহণ করেছিল। তাহারা এত দরিদ্র ছিল যে শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখন্ড জোড়াদিয়া সেলাই করা কাপড়ই ছিল এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিধেয়। ঐ সেলাই জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে সুছিন্দ্রাই। সুছিন্দ্রাই বস্ত্র পরিহিত ভ্রাতৃদ্বয় নাকি পরবর্ত্তী কালে সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় নামে পরিচিত হন। এই দুই ভাই চিরকুমার ও সাধক। এই সাধকদ্বয় অমর ও ত্রিপুরীকুলের কুলদেবতা। এই দুই দেবতার অবস্থাভেদে নাম হইল সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায়, কাথারক, বণিরক, থুবনাইরক, ইখিত্রা বিখিত্রা, কালেয়া কলেয়া, গড়িয়া ও নরশিং।

ত্রিপুরার ককবরক ভাষী জনসমাজের ঔষধ, মন্ত্র, কবচ-এই দেবদ্বয়ের দান বলিয়া কথিত। প্রকৃত পক্ষে এই দেবদ্বয় অযোনি সম্ভবা। হরিশিংনামে এক বন্ধ্যা দম্পতি বনে এই যুগল শিশুকে পাইয়া লালন পালন করেন। ক্রমে পুত্রদ্বয় যৌবনে উপনীত হইলে, মাতা পুত্রদের বিবাহ দেওয়ার অধীর আগ্রহে সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার সন্ধান দেওয়ার জন্য যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকে অনুরোধ করিতে থাকে।

সুকুন্দ্রায়-মুকুন্দ্রায় মানব দেহধারী দেবতা। তাহাদের স্বভাব ধীর গম্ভীর ও কথাবার্ত্তা তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল। শান্ত স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে সকলে মুগ্ধ। রূপেগুণে কাজে কর্মে সকলেই অবাক। সকলের মুখে ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা। এই দুইভাই বনজ শিকড় বাকল, লতাগুল্ম দিয়া পাড়া প্রতিবেশীর চিকিৎসা করিতে শুরু করে। শত শত রোগীকে আরোগ্য করে। কথিত আছে এই দুই ভাই যাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াছে সেই ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়াছে। রোগী আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত দুইভাই রোগীর শিয়রে বসিয়া ঝাড়া ফুঁকা ঔষধ সেবন করাইয়া সুস্থ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট থাকিত। এই দেবদ্বয়ের স্পর্শে মৃতপ্রায় রোগীও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত। এইভাবে যতদিন যায়, তাহাদের বয়স্কাল বৃদ্ধি পায়, তাহাদের মাতার বার্দ্ধক্যও বৃদ্ধি পায়। মাতার মন আর মানেনা। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে। পুত্রদ্বয় কোনক্রমে সন্মত নহে। এই কৌমার্য্যব্রত অটল অবস্থায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুকুন্দ্রায় দেব নরশিং নামে এবং কনিষ্ঠভাই মুকুন্দ্রায় গড়িয়া নামে পরিচিত হয়।

অবশেষে মাতা পিতার অনুমতিক্রমে এক পরমা সুন্দরী, সর্বগুনান্বিতা, বস্ত্রবয়নে দক্ষা, জুমকার্য্যে নিপুনা, গৃহকার্য্যে সুচতুরা এক ষোড়শীকে

আপনগৃহে নিয়া আসেন। মাতা উক্ত কন্যাকে সুকুন্দ্রায় দেবের সেবাযত্নে নিযুক্ত করেন। একত্রে ভোজনে ও শয়নে পরস্পরকে আকর্ষন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সুকুন্দ্রায় দেবের ব্যবহারে নিরাশ হইলেন। পরে কন্যাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গড়িয়া দেবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন, তাহাতেও কোন ফল হইল না। এইরূপ পর পর সাতজন কন্যা বিবাহ উদ্দেশ্যে আনা হইল। দুই ভাইকে সম্মত করিতে না পারিয়া একে একে ছয় কন্যা বিদায় হইয়া গেল। সর্বশেষ কন্যাকেও বিদায় দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। তখন মাতা সপ্তম কন্যাকে বিদায় দেওয়ার পূর্বে মুকুন্দ্রায় দেবকে কন্যার প্রতি আকর্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী যুবক যুবতীদের ডাকিয়া কোন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতে যুবক যুবতীর দল কন্যাকে বন্যফুলে সাজাইয়া কন্যাকে লইয়া সকলে গড়িয়া দেবের নিকটে গেলেন। তখন গড়িয়া দেবকে ঘিরিয়া আদি রসাত্মক গান গাহিয়া নাচিয়া কন্যার প্রতি প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাই গড়িয়া নৃত্যের গান যৌন সম্পর্কীয় অশ্লীল বাক্যে ও ছন্দে আজও গীত হইয়া থাকে।

যেমন:-

আত'কা হাকর লুপে,
আত'কা হাকর লুপে,
চিনি পাড়ানী সিক্লা রকলে
'সিত' তুই' লুপে লুপে।

অনুবাদ :- বৃক্ষ কোটরে টিয়া পাখীর মাথা অর্ধেক বাহিরে, কখনও ভিতরে 'লুপে লুপে' দেখা যায়। তবুও মুকুন্দ্রায় দেব মুগ্ধ হইলনা। কৌমার্য্য ব্রতে অটল থাকাতে তাঁহার নাম হইল গড়িয়া। এই দেবদ্বয় আজিও কুল দেবতা হিসাবে পূজিত। ইহা অবতার বাদের মনোবৃত্তি বিশেষ। চৈত্র সংক্রান্তিতে গড়িয়া পূজা হয়। পূজা সাতদিন চলে। তারপর বৈশাখ মাসের সাত তারিখে গড়িয়া প্রতীক বাঁশ বিসর্জন দেওয়া হয়।

মৎ প্রণীত 'ত্রিপুর সংহিতায়' নিম্নরূপ বর্ণনা আছে।

কালেয়া গড়েইয়া

মোরা দুই ভাই হই, কালেয়া গড়েইয়া।
চৈত্র শেষে হয় পূজা নাচিয়া নাচিয়া।
বছর প্রথম দিনে কালেয়া পূজিবে।

বছরের শেষ দিনে গড়েইয়া ভজিবে।।
মহাবিষু দিনে মিলি, গড়েইয়া লইয়া।
ভক্তিতে মজিবে সদা, নাচিয়া গাহিয়া।।

ত্রৈপুর সংহিতা।

চৈত্র সংক্রান্তি দিনে মহাবিষু। আসামের ন্যায় ত্রিপুরার উপজাতি জনগণও বিষুপর্ব পালন করে। ঘরে ঘরে চাউলের পিঠা তৈয়ার করে। তাহা সকলে মিলিত ভাবে খায়। পরিবারের সকলকে খাওয়ায়। পাড়া প্রতিবেশীকেও খাওয়ানো হয়। এইদিনে সকলে সাধ্য অনুযায়ী ভাল পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান করে। প্রায় শিশুরা নববস্ত্রে সজ্জিত হয়। ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার নামে মদ্য পান করিতে দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনকে বলা হয় হাড়ি বিষু। বৈশাখের সাত তারিখে গড়িয়া বিসর্জনের দিনকে বলা হয় সেনা বা বিষু সেনা।

হাড়ি বিষু দিনে সকলে ঘরবাড়ী ও উঠান পরিস্কার করে। দাঁত মাজে, চুল কাটে, চুল পরিস্কার করে অর্থাৎ কেহ সাবান জলে, কেহ ক্ষার জলে মেয়েরা মাথার চুল ধুইয়া ফেলে। পুরাতন কাপড় চোপর কাঁচিয়া পরিস্কার করে ও রৌদ্রে শুকায়। হাড়ি বিষু দিনে নারী ও শিশুকে ঘাটে ভিড় করিতে দেখা যায়। বিষুদিনে সকলে খুব সকালে স্নান করে। ভাল পোষাক বা নতুন পোষাক পরে। ঘরে ধূপ ধুনা দেয়। কুচাই জল পবিত্র জল। কুচাই ফল, কাঁচা হলদি, তুলসী পাতা ও সোনা জলে ডুবাইয়া পবিত্র জল পাত্রে রাখা হয়। এই পবিত্র জল ঘর বাড়ী, রান্নাঘর, গোয়াল ঘরে ছিঁটাইয়া শুদ্ধ করা হয়। গুরুজনকে প্রণাম করে। সাধ্যমত ভাল খাবার খায়, অন্যকেও খাওয়ায়, গড়িয়া নৃত্যের তালে তালে ঢোল বাজাইয়া আনন্দের আমেজ তোলে। মাতা পিতা ও গুরুজনকে ভক্তি করে। কেহ কেহ নতুন কাপড় দান করে। জল তুলিয়া ভক্তি সহকারে স্নান করায়। গুরুজনকে সযত্নে ভোজন করায়। গড়িয়া প্রতীক লইয়া দলবদ্ধভাবে ঘরে ঘরে গিয়া উঠানে নাচে। তাহাতে আনন্দের জোয়ার বহিয়া যায়। গড়িয়া নাচকে খেরেবাই নাচ বলা হয়। নৃত্যরত দলকে 'গড়িয়ানি সেঙ্গারক' অর্থাৎ গড়েয়ার সৈনিক বলা হয়। যে পরিবারের উঠানে নাচা হয় নাচা শেষে সেই পরিবারের পক্ষ হইতে গড়িয়ার আশীর্বাদের পরিবর্তে যথাসাধ্য চাউল, নগদ টাকা, মদ ও মোরগ ছানা দেওয়া হয়। এইভাবে বৈশাখের সাতদিন পর্যন্ত একে একে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া

নাচিয়া গাহিয়া হাড়িবিষু, মহাবিষু ও সেনাদিন পালিত ও উদ্‌যাপিত হয়। অনাড়ম্বর, সরল ও জনবিরল সবুজ বনে ঘেরা পার্বত্য পল্লীতে ইহার বেশী আনন্দ পূর্ণ উৎসব আর কি হইতে পারে।

চাকমা,মগ এমন কি হালাম সম্প্রদায়ের লোকেরাও মহাবিষু দিন পালন করিয়া থাকে। পার্বত্য জনগোষ্ঠির সামাজিক উৎসব আচরণ ও মানসিকতা প্রকৃতিগত এক ও অভিন্ন। ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন ঘাত, প্রতিঘাতে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মুখী হইয়া নিজেদের হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্যকিছু বলিয়া বাহ্যত পরিচয় দিলেও মূলত: সকলের মানসিকতা ও আচরণ এক ও অভিন্ন। উহাকে Tribalism পার্বত্য সমাজবাদ বলা যাইতে পারে। সকলেই পার্বত্য দেবতার প্রভাবে প্রভাবিত দেখা যায়।

৮। পার্বত্য জনগণের সামাজিক আচরণ ও বংশ পরম্পরায় অভ্যাস ও শিক্ষা

ত্রিপুরা রাজ্যে পর্বতবাসী জনসমষ্টির মধ্যে (১) ত্রিপুরী, (২) রিয়াং, (৩) জমাতিয়া, (৪) চাকমা, (৫) হালাম, (৬) কুকি, (৭) নোয়াতিয়া, (৮)মগ, (৯) লুসাই, (১০) উচুই, (১১) গারো, (১২) মুন্ডা, (১৩) ওরাং, (১৪) সাঁওতাল, (১৫) খাসিয়া, (১৬) ভীল, (১৭) ছাইমল, (১৮) ভূটিয়া, (১৯) লেপচা প্রভৃতি ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এইসব জনগণের খাদ্য, খাবার অভ্যাস ও আচরণ প্রায় এক এবং মানসিকতা ও প্রায় এক, কারণ প্রায় সকল গোষ্ঠীর লোকই সত্যবাদী, সরল, বিশ্বাসী, অতিথি বৎসল, কষ্ট সহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী, শিকারপ্রিয় ও মদ্য মাংস প্রিয়। প্রায় লোকের পেশা জুম এবং অতি অল্প সংখ্যক পরিবারই লুঙ্গা বা সমতল জমি চাষ করিত। ইহাদের পান ভোজনের অভ্যাস আবাল -বৃদ্ধ- ভণিতার মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত দেখা যায়।

(১) তামাক - তামাকের ধূমপানের অভ্যাস সকলের মধ্যেই দেখা যায়। ঘরে ঘরে সকল বয়সের লোক বাঁশের হুঁকায় তামাকের ধূম পান করে। শতকরা নিরনব্বই জনই ধূমপানে অভ্যস্ত। অতিথি আসিলে জলের পরে তামাকের স্থান। প্রত্যেক পরিবারে অতিথিকে তামাক পানে আপ্যায়িত করা সামাজিক রীতিতে গণ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিড়ি-সিগারেট তামাকের স্থান দখল করিয়াছে। সুতরাং ধূমপান জনিত কুফল স্বরূপ কোন সম্ভাব্য রোগ উপজাতীয় লোকের হইতে পারে। Mr. Leuiun লিখেছেন - The Tribals

are addicted to Excesive smooking.

(২) পান সুপারী খাওয়ার অভ্যাস উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর লোকের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। অতিথিকে পান সুপারীও দেওয়া হয়। তবে তামাকের তুলনায় পান খাওয়ার অভ্যাস কিছু কম। পাহাড়ে যথেষ্ট পান জন্মে। কিন্তু কোন জুমিয়া সুপারী- নারিকেল গাছ রোপন করেনা। সুপারী গাছ রোপন করিলে দীর্ঘায়ু হয় না - এই ধারণা বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। অকালে মরিতে হইবে এই বিশ্বাসে কেহই সুপারী চারা বাড়ীর আশে পাশে রোপন করেনা।

সম্ভবত: জুমিয়াদের যাযাবর পেশা জুমচাষে অভ্যস্ত বিধায় যেসব গাছ-গাছড়া দেরীতে ফল দেয় ঐ সব গাছ রোপণ করিতে চাহেনা। কারণ তাহারা কয়েক বৎসর পর পর বাসস্থান পরিবর্তন করে। এই জন্য এইসব গুজব বা প্রবাদ ছড়াইয়াছে মনে হয়।

(৩) গাঁজা - জুমে পর্বত্রগাত্রে গাঁজা চাষ হয়। পাহাড়ে গাঁজা যথেষ্ট ভাল হয়। এই দেশের আবহাওয়া গাঁজা চাষের অনুকূল। গরম ও বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলে গাঁজা চারা অল্প সময়ে বাড়িয়া উঠে। গাঁজা দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়। সামান্য পরিমাণ কচি গাঁজা পাতা মারিয়া গুড়ের সংগে মিশাইয়া বটিকা তৈয়ারী করিয়া সেবন করিলে আমাশয় রোগ নিরাময় হয়। পাঁঠার মাংস আমাশয় রোগের প্রতিষেধক ও রোগ নিবারক। আমাশয় রোগীকে পাঁঠার মাংস খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।

গাঁজা প্রথমে সখ করিয়া গাঁজা সেবীর সংস্পর্শে আসিয়া পান করে, পরে অভ্যাস হইলে পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহারা মায়া বাদে বিশ্বাসী ''ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা'' তাহারা নেশা পানে নিকট আত্মীয় স্বজন, সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের দায়িত্ব বিস্মৃত হইতে চাহে। মায়াবাদীর মানসিক কল্পনায় রামায়ণের রাম-লক্ষণ সীতার বন পথে চলার দৃশ্যকে উপমা দিয়াছে। অগ্রে পরমার্থরূপী ভগবান রাম, তাহার পিছনে মায়ারূপী সীতা। তাহার পিছনে সাংসারিক প্রাণীরূপী সাধক লক্ষণ। সীতারূপী মায়ার আড়াল থাকাতে নররূপী লক্ষণ, ভগবান রামকে দেখিতে পায়না। এই ভাবের সংগে গাঁজার নেশা সাধককে আরও মায়া ত্যাগের নিশ্চিত প্রেরণা জোগায়। এই ভাবের পর আমাদের কর্ত্তব্য ও আচরণ কি! কোন মতবাদরে ঝোঁকে একেবারে ঝুঁকিয়া যাওয়া আমাদের উচিত নহে। সংসারে থাকিয়া নিয়ম সংযমের মধ্যদিয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদনই সুশিক্ষার আচরণ বলা যায়। ত্যাগ ও ভোগ কোনটার দিকেই অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়া উচিত

নহে। এই উভয় অবস্থার ভারসাম্য সমান রাখা অবশ্যই সকলের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব মতবাদ তথা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ। ঐ মতবাদ একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে সাংসারিক জীবনে বা সামগ্রিক জীবনে উপযোগী নহে। পার্বত্য সমাজে ঐ মতবাদ ও আচরণ সংক্রমিত হইয়া অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে। বাস্তববাদী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ সামাজিক উন্নয়ণে ঐ মতবাদ কুশিক্ষার সামিল। ঐ মতবাদের যথার্থ মূল্যায়ণ নির্ভুল আচরণ অবশ্যই প্রয়োজন। অপব্যাখা সাধারণকে, কুপথে, কু-আচরণে ঠেলিয়া দিয়াছে। বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের মধ্যে গাঁজা সেবন দেখা যায়।

(৪) মদ্য প্রস্তুত ও মদ্য পান প্রতিটি উপজাতীয় জনসমাজে প্রচলিত। উপজাতীদের মদ্যপান সামাজিক স্তরে স্বীকৃত। উপজাতীয় সমাজ জীবনে, মদ্য প্রধান ভূমিকা নিয়াছে। অতিথি আপ্যায়ণে, দেব সেবায়, মাতাপিতা-গুরুজনের মনোরঞ্জনে, সন্তোষ সাধনে, মনের মমতা প্রকাশে, সন্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে, উৎসবে, পার্বণে, জন্মে, বিবাহে, শ্মশানে, পার্বত্য মানব জীবনে, গ্রামীন জীবন ব্যাপিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে মদ্যপান প্রচলিত আছে। মদ্যপান নিন্দনীয় নহে সমাজে বরঞ্চ স্বীকৃত। ইহার ফল স্বরূপ বর্ত্তমান পার্বত্য জনজীবন যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে - উহার ফল কেহ দেখেনা। কেহ বলেনা। কেহ বলিতে অগ্রসর হয়না। শুধু জীবন জীবিকায় ইহার প্রতিফলন প্রকাশ পায়। কখন কাহার উপদেশে সমাজে মদ্য প্রস্তুত প্রণালী, উপাদান সংগ্রহের শিক্ষা পাইল। কি প্রয়োজনে প্রস্তুত হইল তাহা বলা কঠিন ব্যাপার।

জন বিরল সবুজ বনে ঘেরা পার্বত্য পল্লীতে হয়ত পাঁচ পরিবারের বসবাস। হাট বাজার অতি দূরে। বন্য উৎপাদিত, প্রাণীজ, উদ্ভিজ সামগ্রী ছাড়া, মানুষের শিল্প নৈপুণ্যে অঙ্গ সজ্জা ও মানসিক প্রসাধনের সুযোগ ছিলনা। বন্যফুলই মেয়েদের অঙ্গ সজ্জার প্রসাধন সামগ্রী। মা শিশুকে, কীট পতঙ্গ, স্থল কচ্ছপ, পাখীর ডিম, পাখীর ছানা, পাকা ফল দিয়া খেলনার সখ মিটায়। মা বনে গেলে, বন হইতে বাড়ীতে আসিলে শিশুর কি আনন্দ। সঞ্চিত বুকের দুধ নিয়া মা শিশুর নিকট উপস্থিত আর মিষ্টি পাকা বন্যফলে, রং বেরঙের পাখাযুক্ত পতঙ্গে শিশুর মনোরঞ্জনের আশায়, স্মিত হাস্য মুখে, বন হইতে মা শিশুর আকাঙ্খিত বস্তু নিয়া গৃহে উপস্থিত হয়।

জুম জীবনে এক মুহূর্তও অবসর নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা ব্যস্ততা, শুধুই কর্মব্যস্ততা। কি নারী কি পুরুষ - জুমের কাজে সারাক্ষন ব্যস্ত থাকে। জুমে

বীজ বুনা, আগাছা নিরানো, জুমে আশ্রয় গৃহ নির্মাণ, আসবাব পত্র, রান্নার সরঞ্জাম জোগাড়, বাঁশের বড় চোঙায় রান্না, জল তোলা ইত্যাদি উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হয়। জুম চাষ বছর মেয়াদী চাষ। তাই বছরান্তে যাহা কিছু থাকে সবই ছেড়ে আসতে হয়। নতুন বছরে নূতন জুমে নূতন উৎসাহে আবার সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য, উপাদান, আসবাব, তৈরী করে নিতে হয়। সমাজে অক্ষরের প্রচলন নাই। বই পুস্তক রচনার প্রচলন ছিলনা। ধান হয়, কার্পাস হয়, তরিতরকারি, মসলা, আদা, হলুদ, কঁচু, আঁখ, তামাক উৎপাদনে এবং মোরগ, শূকর, ডিম, পশুপাখী পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহে সচেষ্ট হয়।

বর্ষা থামিয়া যায়। শীতকাল আসে, রাস্তাঘাট শুকনা হয়। গ্রামে গ্রামান্তরে একে অন্যের নিকট বেড়াতে যায়। ভ্রমণ করে। আত্মীয় কুটুম্ব দেখা হয়। প্রিয়জনে প্রিয়জনে পরস্পর দেখাদেখি হয়। যুবক-যুবতীর দেখাদেখি হয়। কিভাবে সময় কাটে! নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জন অতিথি হইলে আদর অভ্যর্থনা আর খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা! মোরগের মাংস, ডিম, শূকরের মাংস, ছড়ার গুড়া মাছ, ইঁচা, কাঁকড়া, বন্য উৎপাদিত শাকসব্জী দিয়া উত্তম খাদ্য রান্না হয়। আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন। কি গুহাবাসী, কি বনবাসী, কি অট্টালিকাবাসী, মানুষের প্রেরণা ও মমত্ববোধ সকলেরই সমান। গুহাবাসীই কালে অট্টালিকাবাসী হয়। মানুষের হৃদয় আছে, মায়ামমতা, স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতি মানবীয় গুণ সকলেরই আছে। স্থান-কাল- অবস্থা ভেদে বিশ্বাস ও ভাবধারা ভেদে মানুষের মানসিকতা ও অভ্যাস গঠিত হয়। তদ্অনুযায়ী মানুষ আচার- আচরণ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। আমোদের জন্য, প্রমোদের জন্য মদ্য পান করে। মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হয়। তাহাতে লজ্জার মাত্রা কমিয়া যায়। বাস্তব হইতে সরিয়া যায়। মদের নেশাতে বিভোর ব্যক্তি অস্বাভাবিক আচরণ করে। জীবনে যাহা মিলেনা নেশাতে তাহা পায়। কুটিরকে অট্টালিকা মনে হয়, মুর্খকে পন্ডিত মনে হয়। না পাওয়াকে পাওয়া যায়। কুটিরে স্বর্গ চলিয়া আসে। বাস্তবে নয় নেশার অনুভূতিতে। কর্মব্যস্ত জুমিয়া জীবনে অবসর বিনোদনের ও আনন্দ প্রকাশের উপকরণ নাই। তাই সে নেশার আমেজে নীরব পরিবেশকে সরব করিয়া তোলে।

সকল উপজাতি সম্প্রদায়ের যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশার প্রথা আছে। পরস্পর মেলামেশায় একে অন্যের স্বভাব চরিত্র বুঝিয়া চিরসাথী নির্বাচনের অধিকার আছে। সেই জন্য তাহাদের গান আদি রসে ও প্রেম বিরহে পূর্ণ।

ঐ গানের সুরে সুরে, সুরমিলিয়ে বাঁশী ও চং প্রেং বাদ্যের তাল। তাহা ছাড়া দাংদু, ঢোল সারেন্দা, বাঁশের শিঙ্গা, দংদ্রংমা, বাজাইয়া নীরব পাহাড়ের বুকে এক আনন্দ রসঘন ভাবের সৃষ্টি করে। যুবক, যুবতীকে চিরসাথী নির্বাচনে আগ্রহী হইয়াও যুবতী অগ্রাহ্য করিলে যাদু কবচ ও মন্ত্রের আশ্রয়ে নারী বশীকরণের মাধ্যমে পাওয়ার পন্থা অবলম্বণ করিতে দেখা যায়। ঐহিক বাসনার সফলতায় যাদুমন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া হয়। রোগমুক্তির কামনায় দেবপূজা, ক্রিয়াকান্ড অনুষ্ঠান সকলই যাদু বিশ্বাসের ফল।

যাহাই হউক পূর্ব কথায় ফিরিয়া আসি। আবহমান কাল মদ্যকে খাদ্যদ্রব্যের আনুষঙ্গিক পানীয় হিসাবে, সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হইলেও সকলের পক্ষে মদ্যপান মঙ্গলদায়ক নহে। সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী। মদ্যাসক্ত হইলে মদ্যপায়ীর আচরণ-ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে। ঝগড়া, মারামারি, খুনাখুনি, নেশার প্রেরণায় অবাঞ্ছিত ও অশান্তিকর ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যাহা মানসিক ও আর্থিক উন্নয়নে, বিঘ্নকর। মদ্যপায়ী লোভী, ভোগী ও আলস্য পরায়ণ হয়। বিনা ক্লেশে ভোগ লালসায় অন্যের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়। কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান থাকেনা। আদিকাল হইতে পরিবেশের প্রয়োজনে সামাজিক ভাবে, খোলা মনে, মদ্যপান নির্দোষ জ্ঞানে সামাজিক প্রথায় পরিণত হইয়াছে। উপজাতীয় জনমানসে, গভীরভাবে মদ্যপানের নির্দোষ ধারণা, শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। সমাজে যাহা প্রচলন হয় তাহা জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকলের আচরণীয় অভ্যাস হইয়া পড়ে। প্রবল ও পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মঙ্গলকামী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সমাজের কুসংস্কার জনিত কুফলের মাত্রা কমানো চেতনা জাগরিত করা সম্ভব। নতুবা প্রচলিত সামাজিক প্রথা দ্বিধাহীন, ভয়হীন গতিতে প্রবাহমান থাকিবে। যে একবার মদ্যপানে আসক্ত হইয়াছে তাহাকে বিরত করা খুবই কঠিন। স্বেচ্ছায় বিরত না হইলে কাহারো পক্ষে বিরত করা সম্ভব নহে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে মদ্যপানে বিরত রাখাই সমাজে মদ্যপান বর্জনের পথ হইতে পারে।

৯। আদিবাসী জনগণের রোগ উৎপত্তির ধারণা ও যাদুমন্ত্র বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা :-

প্রকৃতির প্রভাব, পার্থিব প্রতিটি জড় ও প্রাণীর উপর অপরিসীম। জন্ম-মৃত্যু, ঝড়বৃষ্টির উপর মানুষের কোন হাত নাই - এই ধারণা পৃথিবীর সকল মানুষের ছিল ও থাকিবে। সুতরাং রোগ নিরাময় ও সকল অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজিতে গিয়া অসহায় মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির

নিকট আত্মসমর্পন করে। এই ভাবধারা সকল ধর্মেই দেখা যায়। প্রাণী দেহ, বাল্য যৌবন ও বার্ধক্য একে একে সকল স্তরে রূপান্তর হয়। নিজের দেহের উপর এইসব রূপান্তর রোধ করার কাহারো ক্ষমতা নাই। মানুষ ইচ্ছা করিয়া কেহই বৃদ্ধ হইতে চায় না কিন্তু সকলকেই বৃদ্ধ হইতে হয়। কেহই মৃত্যুবরণ করিতে চাহেনা - তবুও মৃত্যুর কোলেই শেষ আশ্রয় নিতে হয়। এইসব ভাব ও কল্পনায় তন্ময় হইয়া মানুষ প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে ও পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া ধর্মের আশ্রয় নিয়াছে। মানুষ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ খুঁজিয়াছে। মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি সকলই প্রকৃতির দান। ঔষধাদির গুন প্রকৃতির দান। আমি করি বলিয়া অহঙ্কার করা দৃষ্টতা মাত্র। আমার আমিত্ব কাহারো চিরন্তন নয়। সব প্রকৃতির দান। সর্বশক্তির উৎস প্রকৃতি। মানুষ প্রবৃত্তির প্রেরণা ও বুদ্ধি বলে ভোগের-সুখের ব্যবস্থা করিতে পারে - বিধির বিধান ও প্রকৃতির নিয়মের আওতাধীনেই মানুষের করণীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং যাহারা প্রকৃতির শক্তির উপর বিশ্বাসী হইয়া আত্মসমর্পন করে প্রার্থনা জানায়, সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ক্রিয়াকান্ড অনুষ্ঠানাদি করে, এইসব কর্মকে উপেক্ষা করিয়া নিম্নস্তরের কর্ম মনে করা, এইসব বিশ্বাসী জনগণকে অনগ্রসর ও অনুন্নত মনে করা সঠিক ও নির্ভুল ধারণা নহে। মানুষ অগ্নিসংযোগ করিতে পারে, কিন্তু দহনশক্তি প্রকৃতির, মানুষের নহে। রোগারোগ্যের উদ্দেশ্যে মানুষ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে কিন্তু ঔষধাদির গুণ প্রকৃতির। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যয় বহুল। ধনবান ব্যক্তি ব্যতীত ব্যয়বহুল চিকিৎসা করিতে পারে না। সেইজন্য দরিদ্র জনগণ স্বল্প ব্যয়ে রোগ আরোগ্যের উপায় খুঁজে। যাদুমন্ত্র, তাবিচ ও দৈববলে বিনাব্যয়ে আরোগ্য হয় এরূপ বহু প্রমাণ জগতে বিরল নহে। বহু অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ দৈববলে বিশ্বাসী আদিবাসী জনগণ রোগমুক্তির কামনা করে সুফল পাওয়াতেই বিশ্বাস করে। প্রকৃতি শক্তির উপর বিশ্বাস না থাকিলে কোন ধর্মের ভিত্তি থাকে না। প্রকৃতি শক্তিতে বিশ্বাসই সর্বধর্মের মূল উৎস। পৃথিবীতে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে, প্রতিটি ধর্মের চিন্তাধারা, ভাবধারায় আদিম মানুষের অবদান আছে।

সুতরাং মানব গোষ্ঠীর আদিম চিন্তাধারা, আচার অনুষ্ঠান বর্জন যোগ্য নহে, অধিকতর সংস্কার সাধনে ঐ পন্থা মানব কল্যানে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

আদিবাসী রোগ উৎপত্তির কারণ হিসাবে যেসব ধারণা পোষণ করে এইসব কয়েকটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি:-

(১) ভূমির অভ্যন্তরভাগে প্রোথিত গাছপালা, জীবজন্তুর দেহাবশেষ, বাদুরের বা অন্যান্য জীবজন্তুর দ্বারা সৃষ্ট গুহা বা গর্ত সমূহ দূষিতস্থান, এবং ঐসব দূষিত স্থান প্রভাবিত স্থলে আশ্রয় নির্মাণে বা জুম চাষ করিলে রোগ উৎপত্তি হয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

(২) অপদেবতা অশরীরি প্রাণী তাহারা পরিত্যক্ত বাড়ীতে, বৃহদাকার বৃক্ষে, শ্মশানে ও মানুষের আশেপাশে বাস করে বলিয়া বিশ্বাস করে, ঐসব অপদেবতার চলাফেরায় মানুষের কাজকর্মের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে অসন্তুষ্ট হইয়া রোগ সৃষ্টি করে বলিয়া অচাইদের বিশ্বাস।

(৩) অপদেবতার কুদৃষ্টিকে ছিলি করা বলে। বুড়াছা, বণিরক, থুবনাইরক, তুইবুকমা, নক্‌সু, বুখুকছিনি এই দেবদেবীগণ ছিলিকারী দেবতা। থুবনাইরক ভীষণ দেবতা, সর্বদা হাতে লোহার মুগুর লইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করে। কুক্ষণে মানুষের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া হঠাৎ সুস্থব্যক্তিকে সংজ্ঞাহীন করে। এই অবস্থাকে থুবনাইরকদের 'হাওর'বা হাওয়া লাগা বলে। কবচ ধারণে ও জলপড়াপানে রোগী সুস্থ হয় বিশ্বাস। নকসুমতাই ছিলি করিলে মুখগহ্বর বাঁকিয়া যায়। কবচ ধারণে রোগী সুস্থ হয়। বুড়াছা নাকি বাদুরের গর্তে বা পর্বতের গুহায়, সুরঙ্গে আশ্রয় করে, তাহার স্ত্রীর নাম হাচুকমা। বুড়াছা একটা থলি কাঁধে ঝুলাইয়া হাতে লৌহদন্ড বা মুগুর হাতে লইয়া ঘুরাঘুরি করে। দ্বিপ্রহরে স্নানঘাটে তাহার থলি ঝাড়িলে যে ঐ ঘাটে স্নান করে সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। পূজা পাওয়ার জন্য বুড়াছা ঐ আচরণ করে বলিয়া কথিত। ককবরক ভাষী জনগণ ''মানুষ মরিলে দেবতা হয়'' বলিয়া থাকে। অর্থাৎ ''থাঁয়ই মতাই অংখা''। এই মৃত ব্যক্তিই বুড়াছা হয়। একশত বিশ প্রকারের বুড়াছা আছে বলিয়া কথিত। মৃতব্যক্তির অশরীরি সত্ত্বাবোধে 'মাইখলাই' ভাত, মাছ, মাংস, তরকারী, পান সুপারী, তামাক উৎসর্গ করা হয়। মৃত আত্মা রুষ্ট হইলে ফসল ফলে না। মদ্য প্রস্তুত করিলে মদ্য ভাল হয় না। অসুখ বিসুখ লাগিয়া থাকে এই মতবাদ সমাজে প্রচলিত।

হাচুকমা বন্য পশু-পক্ষীর রক্ষাকারিণী ও পালনকারিণী বলা হয়। গুলিবিদ্ধ হরিণকে যদি কান কাটিয়া না আসিলে, শিকারীর অবর্ত্তমানে হাচুকমা নিয়া

যায় বলিয়া ধারণা, হরিণ বন হইতে আনা সম্ভব না হইলে শিকারী কান কাটিয়া দিয়া আসে।

সপ্তডাইনীর কথা

রোগ উৎপত্তি কারনের জন্য অধিক দায়ী করা হয় সপ্ত ডাইনীকে। তাহাদিগকে 'বুখুক ছিনিও' বলা হয়। তাহারা সাত বোন। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সপ্ত ডাইনীর মন্ত্র যাহারা জানে তাহারাই নাকি 'ছেকাল' হয়। ছেকালকে চাকমা ভাষায় বলে 'ভারাল'। ঐ মন্ত্র জানা লোক ঘুমাইলে নিদ্রাগত অবস্থায় মন্ত্রশক্তির প্রভাবে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জ্বলন্ত মশালের ন্যায় আলোকিত হইয়া ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়ায়। মাথার সংগে নাড়ীভুঁড়ি, পাকস্থলী ঝুলন্ত অবস্থায় চলিয়া যায়। এই মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্যের ঘরে প্রবেশ করিয়া নাকি ঐ ঘরে ঘুমন্ত কোন ব্যক্তির দেহস্থ রক্ত চুষিয়া পান করে। আবার নর্দমা নালাতে পশুপক্ষীর বিষ্ঠা ও মানুষের মলমূত্র ভক্ষণ করে। সে যাহা ভক্ষণ করে উহা তাহার উদরে যায় না। উহা সপ্ত ডাইনীর উদরস্থ হয়। ফলে ছেকালের কখনও উদর পূর্ত্তি হয়না। সর্বদা প্রবল ক্ষুধার্ত্ত থাকে। এইজন্য খাওয়ার লোভী ব্যক্তিকে ছেকালের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

আবার এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ছেকাল সুস্থ মানুষের উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা রোগ উৎপত্তি করে। পেটের পীড়া, পেটে মাংস পিন্ড ঢুকাইয়া দেওয়া, প্রসূতির দুধের বাট নষ্ট করিয়া দুধ বন্ধ করা, চক্ষুরোগ বৃদ্ধি করিয়া চোখ নষ্ট করা, পেট ফাঁপা, বদ হজম, ফুলা, কাটা ঘা চুষিয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা ছেকালদের কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। অচাইগণ বলিয়া থাকে ছেকালের দৃষ্টিতে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। এই বিশ্বাস উপজাতি সমাজে আজও প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত।

অতীতে পুরাতন আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজ নাকি কোন রমনী ছেকাল কিনা পরীক্ষা করিতেন। এই ছেকাল সম্পর্কীয় ভীতি বা বিশ্বাস রাজা প্রজা সকলের সমান। রাজা ছেকাল সন্দেহকৃত ব্যক্তিদের হাত, পা বাঁধিয়া পুকুরে ফেলিয়া দেয়, যাহারা জলে ভাসিয়া থাকিত তাহাদিগকে ছেকাল বলিয়া সন্দেহ করা হইত। যাহারা জলে ডুবিয়া যাইত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইত।

এক প্রকার নিশাচর চিল, কখনও ধূ ধূ শব্দে ডাকে ও কাঁকড়ার সন্ধানে ছোট পাহাড়ী নদীতে রাত্রে ঘুরিয়া বেড়ায়। আবার কখনও ঔয়াং ঔয়াং রবে ডাকে। ছেকাল নাকি ঐ পাখীর আকার ধারণ করে। উপজাতি সমাজে

উনানের পাশে শয্যা পাতিয়া শুইয়াছিল। উনানে ভাতের পিন্ড পোড়া দিয়া রাখিয়াছিল। নিশাকালে অতর্কিতে একটা ঔয়াং চিল ঐ ঘরে ঢুকিয়া উনানের ঐ ভাতের পিন্ড বাহির করিয়া খাইয়া উড়িয়া পালায়। রোগী ভয় পাওয়াতে তাহাকে অন্যগ্রামে তাহার আত্মীয়ের বাড়ীতে সরাইয়া নেওয়া হয়।

কামাখ্যা কামরূপকে যাদুচর্চার পীঠস্থান বলা হয়। তাছাড়া আদিবাসীদের কল্পনায় একটি নারীরাজ্য আছে, তাহাদের পেশা শুধু যাদুমন্ত্র ও বশীকরণ করা এবং ঐ রাজ্যে নারী ব্যতীত কোন পুরুষ নাই। ঐ দেশের সিংহের ডাক শুনিলেই পুরুষের অন্ডকোষ ফাটিয়া যায়, ফলে মারা যায় বলিয়া বিশ্বাস। সেই নারীরাজ্যে কোন পুরুষ পৌঁছিলে মায়াবলে পশুদেহ ধারণ করিয়া রাখে। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের আমলে এক যুবক কামরূপে গেলে তাহাকে ছাগদেহধারী রূপ ধারণ করায়। যুবকটি মন্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে গিয়াছিল। সে এক সুন্দরী যুবতীকে ভালবাসিত, কিন্তু যুবতীর পিতামহ শর্ত রেখেছিল যে উড়িতে পারিবে তাহাকেই বিবাহ দেবে। উড়ার মন্ত্র শিখিতে গিয়া পাঁঠার দেহ পায়। তখন এক ফকিরের আস্তানা ছিল জলায়াতে। ঐ ফকির নাকি পাঁঠারূপী যুবককে পুনরায় মনুষ্যরূপ দিয়া প্রেমিকার নিকট ফেরত পাঠায়। এই ঘটনার অবলম্বনে রচিত গীত ''কুচুক হাসিকাম কা-মানি লাঙ্গি রাজা ন' তান মানি'' বলে বিখ্যাত; যাহা এখনও সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শুনা যায়। কুকি রাজার সহিত ধন্য মাণিক্যের যুদ্ধে কুকি রাজা নিহত হয় তখনই কুকি রাজার মন্দির হইতে গড়িয়া দেবতার মূর্ত্তি ত্রিপুরায় লইয়া আসা হয়। সেনাপতি ছিল রায়কীচাক। সবুজ অরণ্যের শান্তিময় কোলে থাকিয়া জুমিয়ার মানসিকতা ও বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে। রূপকথা উপকথা রচিত হইয়াছে। রোগ ব্যাধির উৎপত্তির মূলে ভাগ্য ও দৈবকে দায়ী করিয়াছে। প্রাকৃতিক কারণে পর্বতবাসী জনগণের জটিল রোগ ভোগ খুবই কম। কারণ পাহাড়ে আলো,বাতাস ও বিশুদ্ধ জল স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। পর্বতের পাদদেশে স্বচ্ছ ঝরণা, উহা স্বাভাবিক কারণে বিশুদ্ধ কোন কোন ঝরণার জলে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

পর্বতবাসী জনগণ সাহসী ও কঠোর পরিশ্রমী। পাহাড়ের উপর নীচে উঠানামা করে কাজেই স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের মাংস পেশী সবল ও সুঠাম। টাটকা ফলমূল তাহাদের আহার্য্য ও জুম উৎপাদিত আতপ চাউলে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ আছে। দৈনিক নিয়মিত আহার ও পরিশ্রম তাহার দেহকে অটুট রাখার কথা। কিন্তু প্রায় জুমিয়াই অভাবী। অনাহার অর্ধাহার তাহার নিত্য সহচর। তাই

অভাবের কারণে দুর্বলতা জনিত রোগ বা ব্যাধি হওয়া সম্ভব। এইসব পার্বত্য অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত - এই তিন রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল। সময়ে সময়ে এইসব রোগ মহামারী আকার ধারণ করে। বর্ষার শেষভাগে প্রচুর পরিমাণে মশা বংশ বৃদ্ধি করে। বন্য মশাগুলির নরম গায়ে সাদা চুনের মত থাকে, গায়ে বসিলে মশা মারার সংগে সংগে রাবার স্টাম্পের মত গায়ে মশার ছবি পড়িয়া যায়। রক্ত চুষা প্রাণী হিসাবে এই মশা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়, ম্বর হয়। ম্যালেরিয়া গাঢ় হইলে কালাম্বর হয়। শরীর কাল হইয়া যায়। বৈদ্যের বনজ ঔষধে ম্যালেরিয়া কালাম্বর আরোগ্য হয়। বেরমা (সিদল) ও তিক্ত খাদ্যাদি ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক।

আজকাল ম্যালেরিয়া রোগ উৎপত্তির বিজ্ঞান সম্মত কারণ ও ঔষধ মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে ঐ চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

কলেরা পার্বত্য জনজীবনে এক ভীষণ ও আতঙ্কজনক ব্যাধি ছিল। উহা মহামারী রূপে দেখা দেয়। অধিকাংশ জনগণের রোগ উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকাতে এই রোগ দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। রোগ উৎপত্তির সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল, জলবায়ুই এইসব রোগ সৃষ্টির বা বিস্তারের একমাত্র কারণ।

পাহাড়ের লোকেরা ঝরণা ও ছোটছড়ার জল ব্যবহার করে। পুকুরের জল ব্যবহার করে না কারণ পার্বত্য পল্লীতে পুকুর নাই বলিলেই চলে। আবার নির্দিষ্ট পায়খানা না থাকিলেও বিস্তৃত পতিত ভূমি ও বন থাকায় ময়লা দুর্গন্ধ কম হয় ও বৃষ্টির জলে স্বাভাবিক ভাবে উহা ধৌত হইয়া যায়। তথাপি একবার কোন কারণে এই রোগ দেখাদিলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া মড়ক লাগে। এক পরিবারের সমস্ত লোকের মৃত্যু ঘটে, শ্রাদ্ধকরার লোক পর্য্যন্ত থাকেনা। গ্রামের লোক ভয়ে দিশাহারা হয়। কেহ পালাইয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। গ্রাম নির্জন ও পরিত্যক্ত হয়। সৎকার করিবার লোক পর্য্যন্ত থাকেনা। কেহ বা নির্জন জুম ঘরে একাকী আশ্রয় নেয় ও রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার অভাবে একাকী মরিয়া পড়িয়া থাকে।

জীবিতকালে যে ব্যক্তি বুড়াছা হাজির করার মন্ত্র জানে সেইরূপ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, বুড়াছা মৃতদেহে ভর করিয়া রাত্রে জীবন্তের মত বেড়ায় বলিয়া সব উপজাতীয় লোক বিশ্বাস করে। এইরূপ ঘটনাকে ত্রিপুরী ভাষায় বলে 'বুমা' বা বাংমা, চাকমারা বলে 'ফুক'। মগ সম্প্রদায়েও এইরূপ বুমা উঠে বলিয়া

বিশ্বাস করে। অচাই এইরূপ মৃতদেহ 'বুমা'র দ্বারা মন্ত্রগুণে কার্য্য হাসিল করিয়া লইতে পারে। মন্ত্র বলে লাংগার (বাস্কেট) তলা কাটিয়া বুমাকে জুমে পাঠায় ও বলিয়া পাঠায় যে তলাশূন্য লাংগা কুমড়া পূর্ণ করিয়া তাহার নিকট আনিতে হইবে। লাংগাতে কুমড়া ঢুকাইলে তল শূন্য বিধায় ইহা পরিপূর্ণ হয়না, সংগে সংগে পড়িয়া যায়। তাহাতে বুমা গ্রামে আসিতে পারেনা। ভোর হওয়ার সংগে সংগে বুমার মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। কারণ সূর্য্যোদয়ের সংগে সংগে বুমা মরিয়া যায়। তখন সকলে গিয়া মৃতদেহ দাহ করে। প্রাচীন কালে এইরূপ ঘটনা ঘটিত বলিয়া বয়োজ্যৈষ্ঠ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে। মৃতদেহের বুকে 'খুন্দ্রুপুই' যুঁইনের শিকড় দিলে বুমা উঠেনা বলিয়া কথিত। লৌহার টুকরা মৃতদেহের মাথার খুলিতে বিঁধিয়া দিলে আর 'বুমা' উঠেনা বলিয়া বলা হয়।

যাহারা জীবিত কালে বুমা উঠার মন্ত্র জানে, এইরূপ ব্যক্তি সকল সন্ধ্যার মূহর্তে প্রাণান্ত হয় এবং মরার কিছু পরে দেহের চামড়া ফাটিয়া ডোরা ডোরা দাগ নাকি হয়। ইহার পর ভাল অচাই দ্বারা প্রতীকার না হইলে গর্জন করিতে করিতে 'বুমা' উঠিয়া যায়। 'বুমা' যাহাকে কামড়ায় সে ব্যক্তি মরে ও অনুরূপ সেও 'বুমা' হয়। যে অচাই বুমা মন্ত্র জানে তাহার ঝাড়া ফুঁকা মন্ত্রতন্ত্র নাকি অব্যার্থ হয়। এই প্রয়োজনে অচাই 'বুমা' উঠার মন্ত্র জীবিত কালে শিখে ও মৃত্যুর পূর্বে নিজ সন্তানগণকে সাবধানে ও গোপনে কবচ, মন্ত্র, জলপড়া ইত্যাদি প্রতীকার ব্যবস্থার শিক্ষা দিয়া যায় বলিয়া লোক মুখে শুনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমাজে এইসব ঘটনা প্রচলিত ছিল বলিয়া বিশ্বাস।

কালী করাল বদনা, খড়্গ হস্তে ভৈরবীবেশে রক্ত নেশায়, উলঙ্গবেশে, দেশে দেশে বেড়ায় ও মদ মত্তাবস্থায় যাহাকে পায় তাহাকে ধ্বংস করে, এই কারণেই বিধ্বংসী কলেরা হয় বলিয়া প্রাচীনকালে প্রাচীন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করিত। তাই কলেরা রোগাদি নিরাময়কল্পে গ্রামে মুদ্রা বন্ধন করা হয়, সেইটিই 'কের পূজা'। কালী পূজা ও গঙ্গাপূজাও ঐ উদ্দেশ্যে করা হয়।

বসন্ত এক মারাত্মক সর্বগ্রাসী রোগ। কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যু হইলে কখনোও দাহ করিতে নাই। মৃত কলেরা রোগীকে প্রবল বৃষ্টি ধারায় শ্মশানে ফেলিয়া রাখিলে জীবিত হইয়া উঠে এইরূপ প্রমাণও আছে। এইসব রোগীকে মাটিতে কবর দিতে হয়, নচেৎ প্রবল রোগ ছড়ায়। মাছি দ্বারা কলেরা, বসন্ত দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। প্রাচীনকালে এই রোগ দেখা দিলে গ্রাম মুদ্রাবন্ধন করে ও কের পূজা করে, শীতলা পূজা করে, কেহ কেহ গ্রাম ছাড়িয়া জুমে

পালাইয়া যায়। তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কলেরা বসন্ত রোগে বনজ ঔষধ অর্থাৎ তৃণগুল্মের শিকড়, পাতা রস খাওয়াইয়া, কবচ ধারণ করাইয়া মন্ত্রে ঝাড়িয়া চিকিৎসা করা হয়। এই প্রথায় কেহ কেহ আরোগ্যও হয়। এইসব বিশ্বাস হইতে আদিবাসী সমাজ এখনও মুক্তি পায়নি। ঐসব চিকিৎসা পদ্ধতি বর্জন করা নয়, এই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করিয়া তোলাই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান কালের উন্নত ধরণের চিকিৎসার সুযোগ নেওয়া উচিত।

আদিবাসীদের বিশ্বাস আমরা যেমন পালিত জীব জন্তু আমাদের ইচ্ছামত বধ করিয়া খাই, দেবতাগণও তদ্রুপ আমাদিগকে খাওয়ার জন্য বধ করে। সুতরাং জীবের বদলে জীব বলি দিয়া ঐ দেবতার উদ্দেশ্য পূজা দিলে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক সময় সুফলও পাওয়া যায়।

জগতে কোন সিদ্ধান্ত বা অনুমান সর্বাংশে সত্য হয়না। আবার একেবারে মিথ্যা তাহাও বলা যায়না। যাহা রটে তাহা কিঞ্চিৎ হইলেও ঘটে। কারণ জগতে চরম বলিতে কিছুই নাই। কোন সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত নয়।

১০। যাদু মন্ত্র, কবচ, পূজা বিশ্বাসী কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা:

ত্রিপুরা রাজ্যে আদি অধিবাসী ১৯টি সম্প্রদায়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনুন্নত, সংখ্যায় অন্যের তুলনায় কম, বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সহিত সমতালে চলিতে পারেনা , আর্থিক, সামাজিক, মানসিক, শিল্প বাণিজ্যে অনগ্রসর বহু উপজাতীয় জনগোষ্ঠী রহিয়াছে। উপজাতীয় জনগণ লাজুক স্বভাবের, স্বার্থ সংরক্ষণে অপারগ, সরল, সত্যবাদী, ভোলানাথ ও মদ্যপায়ী। মহাদেবের ভোলা নাথ চরিত্রই তাহাদের চরিত্র। তাহাদের মানসিকতা ও ভৌগলিক অবস্থা তাহাদিগকে অনুন্নত করিয়া রাখিয়াছে। নৃতত্ত্বের দিক দিয়া ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলি চীন, জাপান, তিব্বত, বার্ম্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েটনামের জনগোষ্ঠীর মত মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত। ত্রিপুরা উপজাতি সম্প্রদায় খন্ড জাতি। আসামের জনজাতি নামে পরিচিত বড়ো জনগোষ্ঠী ও ত্রিপুরার ত্রিপুরীদের সহিত ভাষায়, আচর-আচরণে এক ও অভিন্ন। তাছাড়া মেচ, কুচ, লালং, হাইজং, গারো, ত্রিপুরী, কাছারী প্রভৃতি আরো অন্যান্য জনজাতির ভাষা প্রায় এক, এইসব জনজাতিদের সমষ্টিগত ভাবে 'বড়ো' বা ব্রু বা বরক ভাষাভাষী' নামে পরিচিত। তাহাদের নৃতাত্ত্বিক বিচার, বা ঐতিহাসিক বিচার করিতে যাইতেছিনা - শুধু লোকমুখে প্রচলিত তথ্যাদি

ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য এবং তাহাদের মনে সমাজের সর্বস্তরে যে যাদু মন্ত্র, তন্ত্র, প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে সেই সম্পর্কে এখানে কিছু আলোকপাত করা কর্তব্য মনে করি। কয়েকটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচিত হইলে এই অঞ্চলের সকল আদিবাসীর আচরণ ও মানসিকতা সম্পর্কে আলোচিত হইবে। কারণ প্রায় সকল আদিবাসীর আদিম বিশ্বাসের উৎস এক ও অভিন্ন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামে শতকরা ৯৭ জন আদিম জনজাতির লোক বসবাস করিত।

১১)(ক) চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা

পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য চট্টগ্রামের একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হইলেও, ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও আধিবাসীদের আচার-আচরণে এই অঞ্চলের জনসমুহের সহিত আসাম ও ত্রিপুরার উপজাতিদের বিশেষ মিল লক্ষ্যণীয়। কোন সময়ে উহা ত্রিপুরার মহারাজার শাসনাধীনে ছিল । ইহার নিদর্শন পুষ্করিনী, দীঘিনালার দীঘি, আজও বর্তমান। মায়ুং কুফুর উপকথায় উল্লেখিত দোয়া পাথর দীঘিনালা থানার এলাকাধীনে অবস্থিত।

চট্টগ্রাম সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমতল ভূমিতে, হিন্দু-মুসলমান -বাঙ্গালী জনগণ বাস করিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ, তিপ্রা, লুসাই, বনযোগী, পাংখো, খ্যাং, খুমি, মুরুং, তঞ্চঙ্গ্যা, প্রভৃতি জনগণ বাস করিত। তন্মধ্যে চাকমা জনগণের সংখ্যাই সর্বাধিক। জনসংখ্যায় মগ দ্বিতীয় ও তিপ্রা তৃতীয় স্থানাধিকারী। ১৯৪১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী চাকমার সংখ্যা ১,৩০,০০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার), মগের সংখ্যা ৫৪০০০। তিপ্রা সংখ্যা ৩৫০০০। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও কম।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করে বলিয়া জানা যায়। বৃটিশ সরকার, সরল উপজাতিদের খৃষ্টানে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যেই হউক বা জনগণ পশ্চাৎপদ সরল বলিয়াই হউক, এই রাজ্যে জটিল আইন প্রয়োগ করে নাই। এই অঞ্চল Non Regulated District বা অনিয়মানুগ জেলা ছিল। বিচার আদালতে উকিল, মুক্তার নাই। কদাচিৎ ভারতীয় দন্ডবিধি প্রয়োগ করা হইত। এ দেশে শাসন করার উদ্দেশ্যে The Chittagong Hill Tracts Manual নামে একটি শাসন ব্যবস্থার নিয়মাবলী পুস্তক ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা তিনটি সার্কেলে বিভক্ত। (১) চাকমা সার্কেল, (২) মং সার্কেল, (৩) বোমাং সার্কেল। তিনটি সার্কেলে

তিনটি চীফ বা প্রধান নিযুক্ত আছে। চীফ বৃটিশের শাসনাধীন ছোট দেশীয় রাজা ছিল। যথাক্রমে চাকমা চীফ, মংচীফ ও বোমাং চীফ। প্রতি সার্কেলে তিনশতের অধিক মৌজা আছে ও প্রতি মৌজায় এক একটি হেডম্যান নিযুক্ত থাকিত। প্রতি মৌজার ভূমির পরিমাণ দশ বর্গমাইল হইতে পনের বর্গমাইল। হেডম্যান জুমখাজনা আদায় করিতে পারে। জুম খাজনা পরিবার পিছু ছয়টাকা। কয়েকটি মৌজা লইয়া একটি থানা এলাকায় বিভক্ত ছিল। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি মৌজা। প্রতি গ্রামে একজন গ্রাম সর্দার থাকিত। গ্রাম সর্দারকে কার্বারী বলা হয়। কার্বারী গ্রামের ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ মিটমাট করে। দশ হইতে পনের টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে জরিমানার পরিবর্ত্তে এক বোতল মদ দিয়া ভক্তি সহ প্রণাম করিলে বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া হয়। সামাজিক বিচারই কার্বারী ও হেডম্যানের প্রধান বিচার্য্য বিষয়। সামাজিক বিচার মানে জুম কাটার জায়গা কাড়াকাড়ি জনিত বিবাদ, এক যুবতীকে দুই ব্যক্তির কাড়াকাড়ি জনিত বিবাদ, পরদার গমণে যৌন সংক্রান্ত বিবাদ, মারামারি, হাতাহাতি ইত্যাদি ঘটনা হেড্‌ম্যান, কার্বারী বিচার করে। কার্বারীর কাছারীতে বিবাদ মীমাংসা না হইলে হেড্‌ম্যানের কাছারীতে নীত হয়। তাহাতেও মীমাংসা না হইলে চীফ বা রাজার আদালতে বিচার পাঠানো হয়। হেডম্যান সর্বাধিক ২৫ টাকা ও চীফ ৩০০ টাকা জরিমানা করিতে পারে। চীফ বিচারে তিনমাস কারাদন্ডে দন্ডিত করিতে পারে। পারিশ্রমিক হিসাবে কার্বারী জনগণের সন্মান, মদ ও বার্ষিক খাজনা ছয়টাকা মাফ পায়। গ্রামের শাসক হিসাবে সন্মানিত হয়। কার্বারী সমাজের মাতব্বর ও মুরব্বি হিসাবে সন্মানের পাত্র। কার্বারী থানার কর্মচারীকে মামলা তদন্তে সাহায্য করে।

হেড্‌ম্যান মৌজার ভারপ্রাপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি। শাসন কার্য্য ব্যাপারে আনাগোণা ব্যক্তিগণকে, থানার কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মচারীকে আতিথেয়তা করিতে হয়। এইজন্য তাহার সন্মানে প্রশাসনের ব্যয়ভার বহনার্থে বিনা খাজনায় বারকানি সার্ভিস নাল জমি সরকার হইতে উপঢৌকন পায়। ১৯৪১ সনের আদম সুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীর সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে তিনজন। তন্মধ্যে দেশীয় উপজাতীর সংখ্যা শতকরা ৯৭ জন। লোক সংখ্যা অনুপাতে নালজমি ও জুমের ভূমি প্রচুর। পার্বত্য জনগণের অভাব অতি অল্প। জুম উৎপাদিত ফসলে তাহাদের দৈনন্দিন চাহিদা মিটতো। তখন জুমে যথেষ্ট কার্পাস হইত। ঐ কার্পাস হইতে তূলা হয়।

তূলা চরকী দিয়া বীজ ছাড়াইয়া মিহি তূলা হয়। ঐ তূলা ধূনিয়া চরকা কাটিয়া চিকন চিকন সূতা উৎপাদিত হয়। ঐ সূতায় মগ চাকমা ত্রিপুরী রমণীগণ সুন্দর সুন্দর বস্ত্র বয়ন করিত। সকলে হাতে বুনা কাপড় ব্যবহার করিত। চাকমা রমণীর পরিধান বস্ত্র 'পিন্দন' নামে পরিচিত। পিন্দনে শাবকী নামে কারুকার্য্য খুবই সুন্দর। ত্রিপুরী রমণীরা হাতে বুনা 'রিগনাই' পরিধান করে। চাকমা রমণীর 'পিন্দন' ও তিপ্রা রমণীর 'রিগনাই' প্রায় এক, তবে ত্রিপুরীদের রিগনাই-এ শাবকী থাকেনা। বক্ষবন্ধনী গামছার ন্যায় ছোট কাপড়কে চাকমা ভাষায় খাদী ও ককবরকে রিসা বলে। সব মেয়েরা মাথায় পাগড়ী বাঁধে। চাকমা ভাষায় পাগড়ীকে 'খবং' বলে। ককবরকে কামছুই বলে। স্ত্রী-পুরুষ সকলে হাতে তৈয়ারী জামা ব্যবহার করে।

মায়ানী নদী, কাচলং নদী, কর্নফুলী নদীর উপত্যকার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির বেশী অংশ চাকমাদের দখলে। চাকমা জনগণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে লেখাপড়া শিক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে। পাহাড়ীদের মধ্যে চাকমা জনগণই সর্বাগ্রে শিক্ষিত। তাহারা কৃষিজীবি। সরল ও অতিথি পরায়ণ। কিন্তু বেহিসাবী। সদা বদান্যতায় উন্মুখ, কাহাকে কি খাওয়াইল, কি দেওয়া হইল হিসাব করা যেন ন্যায়সঙ্গত নহে মনে করে। পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে পরস্পর দেনা-পাওনার তীব্র হিসাব নিকাশ কোন উপজাতীয় জনগণই পছন্দ করেনা। পাড়া প্রতিবেশী অভাব বশত: কিছু নিয়াছে তাহা টাকা পয়সা হউক বা খাদ্যদ্রব্য হউক, তাহা দাবী করা ন্যায়সঙ্গত মনে করেনা। এই মনোবৃত্তিই তাহাদিগকে ব্যবসাবিমুখ করিয়াছে। দানশীলতা ও পরোপকারী মানসিকতা তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তি। জুম উৎপাদিত ফসল, ফলমূল, সংগৃহীত বনজদ্রব্য, বিনা পয়সায় পায়, অন্যকে উহা দিলে পয়সা বা মূল্য নেওয়ার প্রবৃত্তি, কোন উপজাতীয় জনগণের হয়না। সংকটকালীন সুযোগ বুঝিয়া কোন দ্রব্যের অধিক মূল্য নেওয়াও সঙ্গত বোধ করেনা। যেমন, কোন দ্রব্য শুধুমাত্র একব্যক্তির নিকটই আছে বর্তমানে তাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু উহা রোগীর ঔষধ তৈয়ারীর ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে উহা বিনা পয়সায় দান করাই পুণ্য কর্ম মনে করে। সেই ক্ষেত্রে আমি যত মূল্য দাবী করি, তত মূল্য দিতে বাধ্য, সুতরাং আমি অধিক মূল্য দাবী করিব এই মানসিকতা তাহারা অপকর্ম মনে করে, এইসব মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিয়া বৃটিশ সরকার দেশবাসী ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বহিরাগত লোকদের স্থায়ী বসবাস নিষেধ করেছিল। কোন শঠতা ও জটিল আচরণ প্রমাণিত হইলে

কোন হঠকারীকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করায়। অবশ্য সেই ব্যক্তি বহিরাগত হইতে হইবে। প্রশাসনের এই ক্ষমতা পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির একান্ন নং বিধি বলিয়া পরিচিত। বহিরাগত জমি চাষ করিয়া বসবাস করিতে চাহিলে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়না। দখল দিলেও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দখল লাইসেন্স রিনিউ করিতে হয়। এইসব মনোবৃত্তি ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির সহিত সহ অবস্থানে টিকিয়া থাকিতে পারে না। কোন জিনিষ বিক্রী করা ন্যায় সঙ্গত মনে করেনা। তাই তাহারা ব্যবসা বাণিজ্যে বিমুখ। বার্মাতে পশু হত্যা ও মাংস ব্যবসা খুবই কম। এইসব মানসিকতা বৌদ্ধধর্ম চর্চার ফল। তাই পার্বত্য গিরি কন্দরে বৌদ্ধ ধর্ম আজও টিকিয়া রহিয়াছে। মগ সম্প্রদায় খুবই ধার্মিক। মগের তুলনায় চাকমা সম্প্রদায় হিংস্র ও অহিতকারী, কুকর্ম ও অপরাধ প্রবণতা চাকমাদের আছে। চুরি-ডাকাতির অপরাধে দন্ডিত, চাকমাদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে অধিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে মগ ও ত্রিপুরী সম্প্রদায় চাকমাদের অপেক্ষা অধিকতর সরল স্বভাবের। কবির কল্পনা প্রসূত নিস্বার্থপরতা, মহান ও উদারতাপূর্ণ নীতিমালা জনবহুল ও কর্মচঞ্চল আধুনিক জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় একদম অচল। মহৎ ভাবপূর্ণ নীতি ও উপদেশ তাহাদিগকে আরও ধর্মভীরু করিয়া তোলে যাহা তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার পরিপন্থী।

চাকমা, মগ সম্প্রদায়ের সকলেই বুড়া দেবতা, গাংপূজা, চুমলাই পূজা মানে। উপজাতীয় দেবদেবী পূজা পদ্ধতির উৎস এক ও অভিন্ন। একই ধরণের দেবতা ও পূজা যার যার ভাষাভেদে নাম পৃথক হইলেও রীতিনীতি ও দেবকল্পনা সম্পূর্ণ অভিন্ন। চু-মানে মদ্য, 'চুমলাই'মদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাহা ত্রিপুরী সমাজে 'নকসুমীতাই' নামে পরিচিত। ইহা সপ্তডাইনীর পূজা বিশেষ। মগ, চাকমাও ছেকালের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে। চাকমাদের বিবাহে 'চুমলাই' দেবতার উদ্দেশ্যে নবদম্পতির বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভে মঙ্গল কামনায় শূকর বলি দিয়া পূজা করা হয়। পূজার উপকরণ সহ বলিবধ্য শূকরের মাথা পূজার ডালি সাজিয়ে নবদম্পতিকে প্রণাম করায় ও সকলে আশীর্বাদ দেয়। ওঝা এই কার্য্য পরিচালনা করে। চুমলাই পূজার সংকেত দৃষ্ট 'ওঝা' নবদম্পতির শুভাশুভ বিচার করে। চুমলাই পূজা সম্পন্ন হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে ঘোষণা করা হয়। তারপর নবদম্পতিকে একপাতে বিশেষভাবে আয়োজিত খাদ্য আহার করিতে হয়। তখন খাদ্য বিনিময়ে একে অন্যকে খাওয়ায় ও পানখিলি বিনিময় করিয়া স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে পান খাওয়ায়।

একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ ও একত্রে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করা দম্পতির লক্ষণ ও কর্ম। এই প্রথা ত্রিপুরী সমাজেও সহাবস্থানের ফলে গৃহীত হইয়াছে। মগ-চাকমা আচরণে প্রভাবিত ত্রিপুরী জনগণই 'নোয়াতিয়া টিপ্‌রা' নামে পরিচিত।

পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে উপজাতীয় জনজাতির লোক সর্বত্রই আছে। দেশ, কাল ও আপন ভাষা ভেদে কিছু পার্থক্য থাকিলেও সকলের দেবকল্পনা, পরকালের ধারণা, পূজা পদ্ধতি, কবচ, যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস এক ও অভিন্ন। ভাবধারার উৎস ও এক। উপজাতির সম্মিলিত ভাবধারা, অর্থাৎ রোগ আরোগ্যের মানসে, শত্রুদমনে, বিপদ মোচনে, শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধির কামনায় প্রার্থনা বা দেবপূজা বেদের বিষয়বস্তুও হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এই ভাবধারা অবলম্বী লেখক ও সমালোচক ঐ ভাবধারাকে আদিম মানবের অনগ্রসর ভাবধারা বোধে উন্নাসিক ভাব প্রকাশ ও নানা মন্তব্য করিতেছে, অথচ সেইসব ব্যক্তির আশ্রয়, ভাবধারার উৎস কোথায় তাহা দেখেনা ও ভাবেনা। নদীর মোহনার, নিকটবর্ত্তী বসবাসকারীগন বড় নদীতে ডুবিয়া স্নান করার অভ্যাস হওয়াতে ঐ নদীর উৎসস্থলে অল্প পরিমান জল, গায়ে ঢালিয়া স্নান করাকে পছন্দ করেনা। বরঞ্চ মোহনাস্থিত জল, উজানবাসীর পরিত্যক্ত, উচ্ছিষ্ট ও ব্যবহৃত। এইসব ভুল ধারণা একে অন্যের অপ্রীতির কারণ। মূলত: সর্বধর্মের ভাব ও কল্পনার উৎস এক ও অভিন্ন। যুক্তি-অযুক্তি, বিচারহীনতা, পরশ্রী কাতরতা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও ভোগ লালসা, অদম্য তৃষ্ণা মানুষকে মনুষ্য নামের অযোগ্য করে ও সমাজে অশান্তি আনয়ন করে। ঐতিহাসিক বিচার ও অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে উপজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, ভাবধারার প্রাচীনত্ব, সকলের কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে। যাহাই পরবর্ত্তী কালের সর্বশাস্ত্রের উৎস হিসাবে, মানুষের শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবে, পার্থিব পশুস্তরের প্রাণী আদিম মানবকে মনুষ্যত্বের আসনে সমাসীন করেছে। যাহার চর্চার ফলস্বরূপ, বর্তমান জগতের জ্ঞানভান্ডার ও মানুষের মনুষ্য উচিত আচরণের পাথেয় ও দিকদর্শন স্বরূপ।

হিন্দু ধর্ম, পার্বত্য জনগণের নিজস্ব ধর্ম। এই সমাজকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণকারী

কে বা কাহারা। কেহ্ কেহ্ উল্লেখ করেন আদিবাসীদের নিজস্ব দেবদেবী সহ্ তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে কাহারো আপত্তি রহিলনা। একথা কি সত্য। তাহাদের ভাবধারা ও দেবকল্পনা হিন্দু ধর্মের উৎস। তাহারাই ভারতবাসীকে প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পন করিতে, অসহায় মানুষের সহায়ক ভাবধারা জোগাইয়াছে। হিন্দু ধর্মের আলোক বর্ত্তিকার ইন্ধন ছিল তাহাদের হাতে। পার্বত্যবাসী জনগণ কি ধর্মান্তরিত হিন্দু। হিন্দু ধর্ম প্রকৃতি প্রসূত, স্বয়ং বর্দ্ধিত, স্বয়ম্ভু। প্রাকৃতিক শক্তিই শম্ভুনাথ। উপজাতীয় জনগণ কখনও ধর্মান্তরিত হিন্দু নয়। তাহারা স্বভাবতই: হিন্দু, তাহাদের পঞ্চম বেদ, সাম্যবর্ণ ও পঞ্চতত্ত্ব অনুসৃত ধর্ম বলিয়া মহা পরিনির্বাণ তন্ত্রে উল্লেখ আছে।

শৈশবে যখন হাইস্কুলে পড়িতাম, তখন আমার শ্রদ্ধেয় হিন্দুশিক্ষক মহাশয় ক্লাসের ছাত্রগণকে পাঠ্যবিষয়ের প্রসঙ্গ ক্রমে ক্লাসের ছাত্রগণকে একে একে কোন ধর্মাবলম্বী জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের নাম উল্লেখ করিয়া উত্তর দিল। অবশেষে তিনি আমাকে কোন ধর্মাবলম্বী জিজ্ঞাসা করিলে আমি সবিনয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলিয়া উত্তর দিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি মন্তব্য করিলেন - পাহাড়ীরা নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে। শিক্ষক মহাশয়ের এই উক্তিতে আমার গভীর দুঃখ অনুভূত হয়। তারপর বিমর্ষ মনে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করি। তখন আমার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। তাহা হইলে আমরা কি আসল হিন্দু নই? অন্যকে অনুকরণ করি মাত্র? তখন হইতে হিন্দুধর্ম আমার নিজের নয় এ বোধ জাগিল। পরবর্ত্তী কালে আমার পূর্ব পুরুষের ঈশ্বরচিন্তায় ও দেবপূজায় পাশ্ববর্ত্তী হিন্দু নামধারীদের কি পার্থক্য তাহা অনুসন্ধান করিতে থাকি। নিজের পূর্ব পুরুষের চিন্তাধারা ও প্রচলিত রীতি নীতি ও দেবদেবীর অবলম্বনে মোক্ষ লাভের পথ খুঁজিতে থাকি ও বংশ পরম্পরায় প্রচলিত বিশ্বাস ও ভাবধারাকে হিন্দুধর্ম পদ্ধতি হইতে পৃথক করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হই। এই অনুপ্রেরণায় আমার জীবনের প্রচেষ্টা 'অচাই সম্মেলন' আবার ব্রাহ্মণ নামধারী প্রথা ত্যাগ করিয়া জীবনের সর্বস্তরের জন্ম-মৃত্যু- বিবাহ সংস্কারাদি অচাই দ্বারা সম্পন্ন করিতে, সমাজের নিকট আবেদন রাখি।

আদিকাল হইতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় জনসমাজের প্রচলিত ভাবধারাই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল উৎস। সুতরাং নূতন মনে নূতন ভাবে নতুন পথের অনুসন্ধান যতই করেছি ততই প্রাচীন হিন্দু মুনিঋষির প্রদর্শিত

মত ও পথের ভাবধারা আমার পূর্বপুরুষের চিন্তাধারায় প্রতিফলন ও অনুরূপ বোধ হইয়াছে। ঐ চিন্তা ধারার উৎস আমার সমাজে দেখেছি, সুতরাং মুনিঋষিদের ঐ মত ও পথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়াছে। ধ্যানে-জ্ঞানে-চিন্তায় যাহা অনুভূত হইয়াছে তাহাই মণিষীদের মুখে অনুরণিত কথিত বা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা নতুন কোন পথ নয়, এবং পার্থক্য ও কিছু নাই, তাহাদের প্রবর্ত্তিত পথ চক্রেই ধ্যানলব্ধ চিন্তাধারায় বারবার আবর্ত্তন করিয়াছি। পৃথকভাবে ছুটিয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই এই চিন্তাধারা নৈস্বর্গিক ধারায় প্রবাহিত। এই শ্বাশত ভাবধারার পর, আপন ভেদ নাই।

ত্রিপুরার মহারাজ এ দেশে বাহিরের ব্রাহ্মণ আনয়নের ফলে ত্রিপুরী সমাজ উপকৃত হয় নাই। বরঞ্চ ধর্মবিশ্বাস, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে, শোষণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তীর্থস্থানে, পিন্ডদানে, শ্রাদ্ধে, বিবাহে, পূজায় যে প্রথা তাহা ধর্মবিশ্বাসী ধর্মান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই লৌকিক ন্যায় বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। শুধু ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ ও পেশার দিকে, প্রাচুর্য্যের দিকে চিন্তা করা হইয়াছে । শিক্ষাদীক্ষা দানে মানসিক গুণাবলী জাগরণে ভক্তদের সমাজ উন্নয়নে কোন আদর্শ বা ব্যবস্থা - উপায় অবলম্বিত হয় নাই। রাজ অনুগ্রহ পুষ্ট পুরোহিত সমাজ প্রভাব প্রতিপত্তি সহকারে রাজ অনুচরের হুঙ্কারে শুধু শ্রেষ্ঠতার গর্ব, আনুষ্ঠানিক কর্মাদির দক্ষিণা নামে পাওনা আদায় করিয়াছে, তাহা প্রাচীন ব্যক্তির মুখে মুখে এখনো শুনা যায়। ধর্মবিশ্বাসের উপর এবম্বিধ আচরণ কেহই সহ্য করেনা, যুগোপযোগীও নহে। তাই সহজ-সরল ও স্বল্পব্যয়ে যাহাতে সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে 'অচাই কমিটি' গঠন করা হইয়াছে - কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের সেইদিকে আজও দৃষ্টি পড়েনি। কথিত আছে, তৎকালীন মহারাজা একলক্ষ বত্রিশ হাজার মুদ্রার বিনিময়ে এদেশে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনিয়াছিলেন। তখন হইতে ত্রিপুরী সমাজে ব্রাহ্মণ দ্বারা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তথাপি বংশ পরম্পরায় প্রচলিত দেবদেবীর পূজা ও বিশ্বাস উঠিয়া যায়নি। ঐসব অনুষ্ঠান অচাই দ্বারা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ফলে ব্রাহ্মণ ও অচাই উভয় বিধ পুরোহিতের প্রভাব অক্ষুন্ন আছে। তাহাতে স্বাভাবিক সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত ব্রাহ্মণের কয়েকটি অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়। আবহমান কাল হইতে উপজাতীয় জনগণের জীবনের সর্বস্তরের পূজা অর্চনা ও জন্ম-মৃত্যু সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর সমাজের অনেক

সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন - গুণীজনের আদর, কবি সমাদর, সতীদাহ নিবারণ ও সমাজ সংস্কার তাহার গুণী মনের পরিচয়। পাশ্ববর্ত্তী হিন্দু-বাঙ্গালীর সহিত নিবে আর দিবে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তথাপি উপজাতিয় সমাজ বাস্তবপক্ষে উপকৃত হইতে পারে নাই।

১১। রিয়াং ও ত্রিপুরী জনগণের সম্পর্কে জনশ্রুতি আলোকে আলোচনা

মগের ভাষায় রি মানে জল। আরাকানে রিয়ুং একটি নদীর নাম। আরাকানের রাজধানীর নাম 'ম্রোহাউং'। ম্রোহাউং -এর অধিবাসীকে ম্রুহুং বলা হইয়াছে। রিয়াংগণও সম্ভবত: রিয়ুং নদীর আধিবাসী। মগের রাজুয়াং গ্রন্থে ম্রোহাউং ও রিয়াং জনগণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। শৈশবে লোকমুখে শুনিয়াছি মগের গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখিত আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জনগণের ভবিষ্যৎ পরিণতি হিসাবে বলা হইয়াছে ফেনী নদীর তীরে রামগড়ে রক্তঝরা ঘটনা হইবে- সেই রক্তে ঢেঁকি ভাসিয়া যাইবে। যাহারা প্রথম ভাগে উত্তরে যাইবে তাহারা সুপরিকল্পিত ভাবে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও মূল্য সংগে নিয়া যাইতে পারিবে। মধ্যভাগে যাহারা যাইবে তাহারা পরিধেয় বস্ত্রাদি নিয়া যাইতে পারিবে। শেষভাগে যাহারা যাইবে তাহারা পথে পথে পড়িয়া মরিবে, যাহাদের জীবন বাঁচিবে উলঙ্গ দেহে অপমান সহকারে পরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। খুব সম্ভবত: বর্ত্তমান চাকমা শরণার্থীর অবস্থাই ঐ গ্রন্থের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। তারপর বিভিন্ন ভাষাভাষী একত্রিত হইয়া একের ভাষার শব্দ অন্যের অন্য অর্থবোধক হওয়ায় হাসি উৎপাদনের কারণ হইবে। সকলের হাসিতে কাজকর্ম ব্যাহত হইবে ও অনাহার জনিত মৃত্যু হইবে।

ক) ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের কথা

ত্রিপুরী সম্প্রদায়কে মগের ভাষায় 'ম্রুহুং' বলে। রিয়াং ও ম্রুহুং জনগণ উত্তরে যাইতে যাইতে আসামে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যেখানে ব্রুহা, ব্রাইহা নামে পরিচিত হয়, ব্রুহা হইতে বড়ো। বুড়ো সম্প্রদায়ের একাংশ বরক নামে পরিচিত হয়। আসামের বরাকনদী বরক শব্দজাত। হিউয়েনসাঙ -এর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে বড়ো রাজত্বের মধ্যাহ্ন কাল বলিয়া বর্ণিত আছে। এই বড়ো জাতির শাখা সম্প্রদায় ক্রমে কাছারী

ও তিপ্রা নামে পরিচিত হইয়া ক্রমে কাছার ও ত্রিপুরায় ছড়াইয়া পড়ে। তৈপ্রা মানে নদীর মোহনা। কোন নদীর মোহনায় বড়ো শাখার এই সম্প্রদায় তৈপ্রা বা তিপ্রা নামে আখ্যায়িত হইল আজিও তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। অহমিয়াগণ শ্যাম রাজ্য হইতে আগত বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত। ক্রমে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাল বিবর্তনে বড়ো রাজগণ পরাজিত হইলে আসামগণ প্রাগজ্যোতিষপুর দখল করেন। তদবধি এই রাজ্য আসাম নামে পরিচিত হয়। মেচ কুচ চুতিয়া, বড়ো সম্পদায়ের অন্তর্ভুক্ত । কুচবিহারের মহারাজ কামাখ্যাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। কুচ বিহারের মহারাজার ভ্রাতা শিলারাই এর অশ্বারোহী মূর্ত্তি আজও গৌহাটিতে দেখা যায়।

লুসাই পাহাড়ে ও আসামের নলবাড়ী জেলায় ত্রিপুরা মহারাজার রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বে ত্রিপুরারাজ্য বহু দূর বিস্তৃত ছিল। ত্রিপুরী জনগণ কোন সময়ে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী ভূমিখন্ডে বসবাস করেছিলেন। আসামের কপিলা নদীর মোহনায় সম্ভবত: তিপ্রা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই বংশের প্রভাবশালী রাজা সুবরায়। তিনিই ত্রিপুরী সমাজের দেবদেবীর পূজা অর্চনার বিধি বিধান ও সামাজিক রীতিনীতি প্রবর্তিত করেন। এখনও অচাইগণ দেবপূজার সংকল্প বাক্যে সুবরায় রাজার দোহাই দিয়া থাকেন। সুবরায় রাজা অবতার বিশেষ, তিনি মহাদেরে অংশে জন্ম বলিয়া কথিত। ভূভার ধারণের জন্য তাহার জন্ম। পূজায় বলি বধ্য জীবজন্তু বধ জনিত পাপ নিজ লেজে বাঁধিয়া সংগে লইয়া যাও, এই কথা বলে সুবরায় রাজার দোহাই দেওয়া হয়। সুব্রাই এর প্রচারিত ধর্ম বাথু ধর্ম। প্রতি বছর কার্বি আলং জেলায় বাথু উৎসব উপলক্ষে বিরাট সম্মেলন হয়। রোগ মুক্তির জন্য দেব পূজা, মন্ত্রতন্ত্র, যাদু বিশ্বাস, কবচ ধারণ ইত্যাদি বিধি, বাথু ধর্মের অঙ্গ। সমগ্র বড়ো গোষ্ঠির লোক ভক্তি সহকারে বাথু ধর্ম ও আচরণ পালন করিয়া থাকে।

থ) রিয়াং সম্প্রদায়ের কথা

রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত জনগণ ত্রিপুরা মহারাজার সংস্পর্শে আসার পূর্বে বর্তমান বাংলা দেশের কাচলং অববাহিকায়, পার্বত্র প্রদেশে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমায়, নয় ব্লক পরিমিত ভূমিখন্ডে, বাস করিত। ঐ স্থানের নাম ছিল কাঁইস্কক। জুম ছিল রিয়াংদের জীবিকা। তাহারা মহিষ, ছাগল, শূকর, কুকুর, বিড়াল, হাঁস ,মুরগী, কবুতর গৃহে পালন করিত। বন্যজন্তু ও পক্ষী ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে রিয়াংগণ খুবই দক্ষ। কথিত আছে কামি

কাঁইস্কক গ্রামে ১২৬ পরিবার বাস করিত। তখনকার দিনে রাফগুড়ের ব্যবহার ছিল না। তামাক সাদা 'মাকে' দিয়া ধূম পান করিত। হাঁড়ি পাতিলের ব্যবহার করিত না - রান্নার কাজে ও জল তোলার কাজ বড় বড় বাঁশের চোঙায় চলিত। গুদক, ভাত, সব চোঙায় সিদ্ধ। জুমে উৎপাদিত তামাকের নাম 'দুরপয়' - উহা বাঁশের দাবায় ধূমপান করিত।

রিয়াং সম্প্রদায় বারটি পাঞ্জিতে বিভক্ত। পাঞ্জি মানে গোত্র বা টোটেম। (১) মলছুই, (২) মেস্কা, (৩) তৈমুক য়াফাক, (৪) ওয়ারেঙ, (৫) আপেত:, (৬) চরকী, (৭) মীসা, (৮) চপ্রেং, (৯) নকখাম (১০) য়াক কচ:, (১১) দলবং (১২) রায়কীচাক।

রিয়াংগণ কালরং ভালবাসে। রিয়াং রমণীগণের পরিধেয় বস্ত্র রিগনাই, রিষা, গলার মালা 'তাংপুই' সকল কাল রঙের। সর্বাঙ্গীন পোষাক কাল রং-এ ভূষিত। মেয়ে-পুরুষ উভয়ে মাথায় লম্বা চুল রাখে, কানে ওয়াকুম পরে। পুরুষেরাও হাতে বল্যা কানে ওয়াখুম পরিত। পুরুষদের ওয়াখুম মেয়েদের তুলনায় ছোট। ত্রিপুরী ও রিয়াংগণের উপাস্য দেবতা ও পূজা পদ্ধতি প্রায় এক। অপদেবতার দৃষ্টিতে রোগ সৃষ্টি হয়, এ ধারণা সকলের একই প্রকার। রোগ জীবাণু দ্বারা রোগের সৃষ্টি ও বিস্তার হয় এই কথা তাহাদের কল্পনাতীত। আদিবাসীগণ পাহাড়ের উচ্চ স্থানে বাস করে, বৃষ্টির জলে গ্রাম -প্রকৃতির নিয়মে ধৌত হইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়। পাহাড় উচ্চস্থান বিদায় বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোর অবাধ চলাচল। সবুজ গাছপালা আচ্ছাদিত স্বাভাবিক ব্যবস্থায় বাসস্থান স্বাস্থ্যের অনুকূল। পাহাড়ে জীবাণুবাহী মশাও কম জন্মে। পাথরের ঝরণার জল স্বচ্ছ, বালু ও পাথর কনায় পরিস্রুত জল পান করে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে আবহাওয়া ও পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল । রোগ জীবাণু আক্রমণের আশঙ্কা ও কম। রোগ হইলে দেবতার কুদৃষ্টি জনিত হইতে পারে ইহাই ধারণা। আদিবাসী জনগণ রোগমুক্তির জন্য (১) পূজা করে, (২) কবচ ধারণ করে, (৩) মন্ত্র দ্বারা ঝাড়া ফুকা করে, (৪) গাছ গাছড়ার তৈরী ঔষধ সেবন করে, (৫) রোগ নির্ণয়ের জন্য দিশা দেখে গণনা করে।

তকখান্তাই মালভূমি

'তকখান্তাই' মালভূমিতে লুসাই পাহাড় হইতে উৎপত্তি হইয়া দেমাগ্রী, খেমাগ্রী জল প্রপাতের সৃষ্টি করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। বহু সমতল ভূমি ও নগর সৃষ্টি করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর

দৈর্ঘ্য ১৭০ মাইল, প্রস্থে এক মাইল প্রশস্ত। এই নদী হইতে ইচ্ছামতি, হালদা, চেঙ্গী নদী, কাচলং, সুবলং, রাইখ্যং, কাপ্তাই প্রভৃতি শাখানদী উঠিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু ভূখন্ডে বিস্তৃত হইয়াছে। কর্ণফুলী নদীর প্রধান শাখানদী কাচলংনদী। কাচলং নদীর প্রশাখা নদীই মায়ানী নদী। এই মায়ানী নদীর অববাহিকায় দীঘিনালা থানা, ও দুয়াপাথর অবস্থিত। ত্রিপুরা মহারাজার প্রাচীন নিদর্শন দীঘির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে দীঘিনালা থানা। মায়ুংকুফুর রূপকথায়, লিকারাজার রাজকন্যাকে দোয়া পাথরে লইয়া গিয়াছিল বলিয়া গল্পে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাচলং নদী শাখা প্রশাখা গঙ্গারাম নন্দারাম উপনদী পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া উৎসস্থল পর্বতে সমাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গারাম, নন্দারাম অববাহিকায় বিরাট মালভূমি'তকখান্তাই' রিয়াংদের বাসস্থান ছিল। নয়ব্লক পরিমিত বিস্তৃত এলাকা নাকি রিয়াং শাসিত এলাকা ছিল। বর্ত্তমানে ঐ এলাকায় রিজার্ভ ফরেষ্ট।

জুমিয়া পাহাড়ী পুরুষগণ, জুমের ফসল তোলার ভার মেয়েদের দিয়া, কার্ত্তিক - অগ্রহায়ন মাসে ফরেষ্ট রক্ষকের অনুমতিক্রমে ঐ রিজার্ভ হইতে বাঁশ কাটিয়া চালি বাঁধিয়া মায়ানী নদীর মোহনায় বাজারে ঐ বাঁশ বিক্রী করিয়া হাতে বেশ পয়সা উপার্জন করে। বর্ত্তমানে কর্ণফুলি তীরস্থ কাপ্তাই পেপার মিলে ঐ বাঁশ চালান দেওয়া হয়।

'তকখান্তাই' মালভূমি প্রায় পাঁচ বর্গমাইল পর্বত শিখরে সমতল ভূমি। অনুমান ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তথায় রিয়াংদের বিরাট গ্রাম নাকি ছিল। রিয়াংগণ পাহাড়ে জুম করিত। রিয়াংগণও অন্যান্য জুমিয়ার মত কঠোর পরিশ্রমী। জুম কাটা, আড়াবাছাই, জুমে আগাছা বাছাই, বেতের লাংগা, অন্যান্য বেতজাত প্রয়োজনীয় বাস্কেট বুনা, বাসগৃহ নির্মাণ করা, ঢেঁকি, ঢেঁকির সরঞ্জাম তৈয়ারী করা প্রভৃতি কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত। তবুও এই ব্যস্ততার মধ্যে তাহাদের পূজা অনুষ্ঠান নাচ গান মদ্যপানে আনন্দ মুখর করিয়া তোলে। কলরবে পর্বতের নির্জনতা , নীরবতা ভঙ্গ করে।

জুমপেশা যাযাবর বৃত্তি। বছর বছর এ পাহাড়, ঐ পাহাড় ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহাড়ে জুম চাষ করে। জুম পেশায় স্থাবর সম্পত্তি বলিতে কিছুই নাই। জুম পেশা যেমন অস্থায়ী দৈনিক কাজকর্মও তেমনি অস্থায়ী। ধরুন, গৃহবধু জল আনে, জলফেলে হাঁড়ি বাসন মাজে, আবার তাহা উচ্ছিষ্ট হয়, আবার মাজে, কলসী ভাঙ্গিয়া যায়, থালা বাসন ক্ষয় পায়, তবুও গৃহবধুর বিশ্রাম নাই, কর্ম কিছুই নয়, শুধু দুইবেলা রান্নাবান্নার কাজ। তেমনি জুম পেশা

নতুন জুমে, নতুন নতুন কর্ম, গত বছর যাহা করা হইল এ বছরও পুন: সেই কর্ম নতুনভাবে করা। ঘরবাড়ী নির্মাণ, ঢেঁকি, ঝুড়ি প্রয়োজনীয় সব করা, ফসলতোলা, নতুন বছরে নতুন জুমে, নতুন কর্মসূচী। জুমিয়াগণ বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধা হয়, দুর্বল হয়, রোগী হয়, অক্ষম হয়, কিন্তু করণীয় পূর্ব্ববৎ চিরদিন একই রকম থাকে। ব্যস্ততা শুধু ব্যস্ততা। অক্ষর চর্চা, সাহিত্য চর্চা, তাহার জীবনে হয়না। কাজের মধ্যে গান, কাজের মধ্যে নৃত্য, কাজের মধ্যে রূপকথা- উপকথা, রঙ্গরসের কথা বলা। এই কঠোর শ্রমে তাহাদের আয় মাথাপিছু অতি সামান্য, খাইয়া-পড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই সুখী। কিন্তু তাহাও হয়না। নির্মম দারিদ্র্য, অনাহার ও অর্দ্ধাহার জুমিয়া জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা। বিলাস দ্রব্য, প্রাচুর্য্য জুমিয়ার জীবনে বিরল। রোগ ব্যাধি, অজ্ঞতা তাহার নিত্য সহচর। চিরদিন আত্মীয় কুটুম্ব সহকারে মান অভিমান অন্তরে লইয়া বাস করে। কিন্তু অন্যজাতি বা ব্যবসায়ীর সহিত তাহাদের আত্মীয়সুলভ মান অভিমান খাটে না। ক্ষেত্র পাত্র বুঝেনা, কোন জিনিষের কি মূল্য ধারণা নাই। বিদেশী শাসক, দেশীয় লোককে শাসন যন্ত্রে দাঁড় করাইয়া শাসন ও শোষণ কায়েম রাখিতে চাহে। এহেন পরিবেশে রিয়াংগণ, ও জুমিয়া জনগণ বাস করে।

রিয়াংদের ত্রিপুরায় আগমণের কথা

একদা রিয়াং ও কুকির জুম পাশাপাশি ছিল। একটি বৃক্ষ হেলানো ভাবে রিয়াংদের জুম সীমায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ঐ গাছের খুঁড়লে, সুরঙ্গের ভিতর ধনেশ পাখীর বাসা ও ছানা ছিল। এই ধনেশ পাখীর ছানার অধিকার লইয়া রিয়াং ও কুকিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ বিবাদের ফলে উভয় দলে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল। একজন রিয়াং যুবতীর সহিত এক কুকি যুবকের ভালবাসা ও গোপন সম্পর্ক ছিল। রিয়াংগণ কুকিদের আক্রমণের উদ্যোত হইলে ঐ রমণীর দ্বারা খবরটি কুকি মহলে ছড়াইয়া পড়ায় কুকিগণ রিয়াংদের উপর অতর্কিতে আক্রমন করিয়া নির্বিচারে হত্যা, লুন্ঠন, ও গৃহদাহের মাধ্যমে তান্ডব চালায়। শিশু-বৃদ্ধ-মহিলা কেহই রক্ষা না পাইয়া রিয়াংগণ গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য হয়। যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহারা অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলের পরামর্শক্রমে রিয়াং সাত ভাই - (১) তুইলহা, (২) তুইক্লুহা, (৩) য়ংসিখা, (৪) পাইসিখা, (৫) শাম-ছহা, (৬) পাইমছ:হা, (৭) থাইমছহা ত্রিপুরা মহারাজের শরণ লইতে স্থির করিল। এই নেতৃস্থানীয় সাতভাই বাঁশের চালিতে করিয়া গোমতী নদী বাহিয়া ত্রিপুরা মহারাজের

নিকট উপস্থিত হইল। মহারাজ এই অপরিচিত আগন্তুকদের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। তখন ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন গঙ্গামাণিক্য। তাঁহার তিনরাণী। ঈশ্বরী, মানবতী, গুনবতী। বড় মহারাণী ঈশ্বরী তাহাদের আগমণের উদ্দেশ্য সবিশেষ জানিতে চাহিলে - সাতভাই, তাহাদের সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ নিবেদন করিয়াছিল। তাহাদিগকে সরল ও অতিশয় কাতর দেখিয়া মহারাণীর দয়া হইল। তাহাদের প্রার্থনা মতে মহারাণী ঈশ্বরী তাহাদিগকে ধর্মপুত্ররূপে বরণ করিতে রাজী হইলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে তাহাদিগকে ধর্মপুত্র হিসাবে বরণ পর্বে মহাদেবী নিজ স্তনদুগ্ধ সবার মুখে সিঞ্চন করিয়া সস্নেহে ধর্মপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে রিয়াং রমণীদের সহিত রাজা বংশের যুবকদের বিবাহ সম্পর্ক হইয়াছিল। রাজ বংশে রিয়াং রমণীর গর্ভজাত পুত্রদের কর্ত্তাবংশ সম্ভূত বলিয়া তাহাদিগকে নাকি রায় উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তখন হইতেই রিয়াং সর্দারের সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি রায় হইয়াছিল। এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত। ত্রিপুরা মহারাজের রাজত্বকালে রাজকার্য্যে, যুদ্ধবিগ্রহে রিয়াংদের অবদানের কথা উল্লেখযোগ্য।ধন্যমানিক্যের আমলে রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত রায়কাচাক সেনাপতি ছিলেন।

(গ) নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের কথা

ত্রিপুরী সম্প্রদায় মূলত: দুই শাখায় বিভক্ত, যথা - (১) পুরাণ ত্রিপুরা (তিপ্রা) ও (২) নোয়াতিয়া তিপ্রা। পূর্বে সকল ত্রিপুরীই নামের শেষে ত্রিপুরা লিখিত। শুধু তাহাই নহে, গারো, খাসিয়া, মগ, চাকমা প্রভৃতি উপজাতীয় লোকের উপাধি হিসাবে নামের শেষে জাতির নাম লেখা প্রচলিত হইয়াছে।

বৃটিশ সরকার সমস্ত আদিবাসীগণের আকার-আকৃতিতে পার্থক্য না পাওয়ায় তাহাদের সুবিধার্থে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নামের শেষে সম্প্রদায়ের নাম উপাধি হিসাবে শাসন কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছিল। বর্তমানে পুরাণ তিপ্রাগণ নামের শেষে দেববর্মা উপাধি ব্যবহার করে।

ত্রিপুরা মহারাজার সহিত বার্মারাজার যুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বে ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা বার্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই যুদ্ধে বহু ত্রিপুরী সৈন্য, বার্মা রাজার সৈন্য ও গ্রামবাসীদের হাতে বন্দী হন। ঐ যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী ত্রিপুরী সৈন্যদেরকে পরবর্ত্তি সময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয় । ত্রিপুরী সৈন্যগণ দায়মুক্ত হইয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে। সেই দেশের রমণীগণের

সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া ঐ সব অঞ্চলেই বসবাস শুরু করে । যেদল ব্যাঙ পাহাড়ে বসতি করিল তাহারা ফাটং দফা নামে পরিচিত হইল। বার্মা ভাষায় ব্যাঙকে 'ফা' ও পাহাড়কে 'টং' বলা হয়। এইভাবে ত্রিপুরীগণ বা নোয়াতিয়া সম্প্রদায় পরবর্তী সময়ে ফাটং, নাইটং, টংবাই, মংবাই, আনক, দেনন্দক প্রভৃতি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। পরে তাহারা নতুনভাবে ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নোয়াতিয়া দফা নামে পরিচিত হয়। নোয়াতিয়া সমাজের দেবদেবী পূজা অর্চ্চনা, সামাজিক আচার আচরণ ভাবধারা পূর্ববৎ পুরাণ তিপ্রা সম্প্রদায়ের সংগে এক ও অভিন্ন। ইহা মাত্র মগ- চাকমা সমাজের প্রভাবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বা পরিবর্তিত হইয়াছে। নোয়াতিয়াগণের জীবনের সর্বস্তরের পূজা-অর্চনা, জন্ম-মৃত্যু সংস্কারাদি অচাই দ্বারা সম্পন হইয়া থাকে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ত্রিপুরা ও বার্মার যুদ্ধের পরিণতি সন্ধির মাধ্যমে মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া কথিত। আরকানের সীমানায় পর্বত্রগাত্রে প্রস্তরে নাকি একটা কদলীবৃক্ষ ফলসহ অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রস্তর কদলী ফল যতদিন না পাকিবে, ততদিন একে অন্যের রাজ্য আক্রমণ করিবে না এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মীমাংসা হইয়াছিল।

(ঘ) কাছাড়ীদের কথা

আসামের নলবাড়ি জেলায় একসময় ত্রিপুরা মহারাজাদের রাজধানী ছিল । ত্রিপুরীরা বড়ো সম্প্রদায়ভুক্ত । গৃহবিবাদ ও অন্যান্য কারনে বডোগোষ্ঠীর একটি শাখা কপিলানদীর মোহনায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বসবাস করেছিলেন। তাহারাই পরবর্তীকালে তিপ্রা আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পার্বত্য প্রদেশে কিছু অংশ ভূমিখন্ড দখল করিয়া তাহারা সেখানে রাজত্ব শুরু করেন। ঐ ভূমিখন্ড কপিলা নদীর মোহনায় ছিল। নদীর মোহনাকে ককবরকে তুই-প্রা বলে। তুই-প্রার অধিবাসীগণ তুই-প্রা নামে খ্যাত হয়। এই তুই-প্রা বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাছিলেন সুবরায়। তিনি খুবই প্রভাবশালী নৃপতি ছিলেন। মহারাজ ত্রিলোচন কাছাড় রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কাছাড় রাজ্য হেড়ম্ব রাজ্য নামে পরিচিত ছিল।

ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ভারতীয় অপুত্রক দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এক নীতি প্রণয়ন করেন। তখন কাছাড়ের রাজধানী ছিল মাইবং। বড়লাটের নীতি হইল অপুত্রক রাজার মৃত্যু হইলে দেশীয় রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কোন দত্তকপুত্রকে রাজ্যভার দেওয়া হইবে না। এই নীতিতে কাছাড় রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ কাছাড় রাজা অপুত্রক ছিলেন। কাছাড়ের রাজা নি:সন্তান হওয়াতে স্বভাবত: এই রাজ্য রাজার মৃত্যুর পর বৃটিশ শাসনাধীনে চলিয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বে এই নি:সন্তান রাজা ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। তাহার স্ত্রী-র সহিত মনমালিন্য হওয়ায় তিনি সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সম্ভবত: তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর মৃত্যুর পর কাছাড় রাজ্য বৃটিশের শাসনাধীনে চলিয়া যায়।

অচাই কাছাড় রাজার জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ উৎসবে পুরোহিত্য করিতেন। অচাই-এর বাড়ীতে অশৌচ হইলে রাজা অচাইকে সংস্কার কার্য্যাদিতে না পাওয়ায় ক্ষুন্ন হইয়া 'ঘিষিয়া' নামে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত পদ সৃষ্টি করেন। কথিত আছে ঘিষিয়া যেকোন অবস্থায় অশুচি হয়না। ঘিসিয়ার নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে, বা তাহার স্ত্রী সদ্য প্রসূতি হইলেও অশুচি গণ্য করা হইত না। কথিত আছে Gicia is seven days older then God. ঘিষিয়া ভগবানের অপেক্ষা সাতদিনের জ্যৈষ্ঠ। কাছারী ভাষা ও তিপ্রা ভাষা অতি কাছাকাছি। সামাজিক রীতিনীতিতেও সাদৃশ্য আছে। বড়ো গোষ্ঠীর সকল উপজাতীয় জনগণের মানসিকতা, সামাজিক রীতিনীতি ভাবধারা ও ধর্মবিশ্বাস প্রায় এক ও অভিন্ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১২। অচাই ও কার্য্যাবলী এবং সমাজে তাহার স্থান।

'অচাই' শব্দটি সম্ভবত: আচাই শব্দ হইতে উৎপন্ন। আচাই মানে জন্ম। অচাই গর্ভবতীর প্রসবে সহায়ক। ক্রিয়াকান্ডের সহায়ক, পরিচালক হিসাবে এই অচাই শব্দ দ্বারা বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অচাই আছে।

মানুষ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একত্রে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে থাকে, ক্রমে সমাজ গঠন হইলে সামাজিক করণীয় কার্য্যাদির প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। সমাজ গঠন ও অন্যান্য সকল কার্য্যাদি মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেরণা হইতে লাভ করিয়াছে। অচাই এর কর্ত্তব্য কর্ম, ক্রিয়া কান্ড, পূজাবিধি ইত্যাদি, অনেকটা দৈবপ্রদত্ত কিছুটা সহজাত প্রবৃত্তি প্রেরণা হইতে উদ্ভুত। সমাজে অচাই এর এক অপরিহার্য্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। অচাই এর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অপরিসীম। প্রবাদ আছে :-

'কতর কৗরৗই তংগৗই মান-অ,
অচাই কৗরৗই তংগৗইই মান-য়া''

''অর্থাৎ শাসক ছাড়া -কিছুদিন চলা যায় কিন্তু অচাই ছাড়া সমাজ একেবারে অচল।''

অচাই দেবতার প্রতিনিধি। দেবতার অভিপ্রায় অচাই এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অচাইকে বিধি নিয়মপালন করিতে হয়। আহারে বিহারে সংযত হইতে হয়। অচাই পূজনীয় ব্যক্তি, রাজাও অচাইকে সম্মান ও ভক্তি করিতে হয়। অচাইকে হালাম ভাষায় চুয়াস্তাই বলে তাহার অর্থ ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত। অচাই বাসি ভাত তরকারী, উচ্ছিষ্ট বাছিয়া চলিতে হয়। মিথ্যা কথন, উলঙ্গ হইয়া স্নান করা নিষেধ। অসন্তোষ প্রকাশ করা, অভিশাপ দেওয়া, পরনিন্দা, পরচর্চা করা নিষেধ। বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করা নিষেধ। পূজার পূর্বদিনে পানসুপারী দিয়া অচাইকে পূজা পরিচালনা করিতে অনুরোধ করিতে হয়। একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে উপবাস করিতে হয়। পূজানুষ্ঠান চলা পর্য্যন্ত পবিত্র দেহমনে থাকিতে হয়। অচাই এর শরীরে দেবতা ভর করে।

অচাই একাধারে পুরোহিত ও চিকিৎসক। রোগীর পরিচর্য্যা, রোগীকে সান্ত্বনা

ও অভয়দান, পথ্যাপথ্য বিচার, রোগ নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ, কোন অপদেবতার দৃষ্টিতে রোগ উৎপত্তি হইয়াছে দিশারী দেওয়া অচাই এর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য। কিন্তু মদ্যপায়ী, অবিমৃষ্যকারী ও নিরক্ষর অচাই এই সব দায়িত্বও কর্ত্তব্য পালন করিতে অযোগ্য বিধায় সুফল ফলেনা ও সমাজের লোক অনগ্রসর থাকে।

ভূমি ও রমণী উভয়েই কৃষিক্ষেত্র। কর্ষিত ফসল উৎপাদনের বিঘ্ন এড়াইবার জন্য, সুফলের জন্য, রক্ষার জন্য কৃষিক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে পূজা হয়, তেমনি গর্ভবতী রমনীকে কেন্দ্র করিয়া পূজা হয়। গর্ভাবস্থায় মলিপূজা, তালবাকলাই পূজা করা হয়। ঐ সব অচাইকে পরিচালনা করিতে হয়, শুভাশুভ ব্যক্ত করিতে হয়, অপদেবতা বা ছেকাল যাহাতে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট না করিতে পারে সেজন্য কবচ, মুদ্রা, বান- চালানের হাত হইতে রক্ষা করা অচাই এর কার্য্য। কেহ কেহ গর্ভ খালাস না হওয়ার জন্য মন্ত্রে ধরনী বন্ধন করে। ধরনী বন্ধন থাকিলে উহা মন্ত্রদ্বারা খুলিয়া দেওয়া অচাই এর কার্য্য। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে ঔষধ প্রয়োগ, কবচ মন্ত্র ঝাড়া, জলপড়া, তেলপড়া দেওয়া, কন্ড বা ফুল সম্যক বাহির না হইলে মন্ত্রে ঝাড়িয়া সুস্থ প্রসব করানো অচাই এর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। প্রসবের বেগ অধিক সময় অতিবাহিত হইলে পূজাদি দেওয়া কবচ দেওয়া অচাই এর করনীয়। এইসব দায়িত্ব পালন করিতে না পারিলে সে ভাল অচাই নহে। অচাই বিদ্যা উত্তম রূপে আয়ত্ব করিতে হয়।

প্রসব কালে অচাই পুরুষ বিধায় প্রসৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শের প্রয়োজনে দুইজন মহিলা সাহায্য কারী থাকে তাহাদিগকে গুমাজুক লাইমাজুক বলে। প্রসব হইলে ঐসব সাহায্যকারীকে ভোজন করাইতে হয় ও দক্ষিণা ও নূতন কাপড় দিতে হয়।

আবু মানে অশৌচ। প্রসূতিকে অশুচি গণ্য করা হয়। আবু দুই প্রকার ১) আবুকীথাং বা সদ্য অশৌচ। শিশুর নাভি খসিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কালকে আবু কীথাং বলে। তিন রাত্রি বা পাঁচ রাত্রি পর নাভি খসিয়া পড়ে। নাভি খসিয়া পড়িলে অচাই ঘাটে পূজা দেয় তখনই প্রসূতি ঘাটে গিয়া ঘাটের জল ব্যবহার করিতে পারে, নতুবা ঘাটে যাওয়া ও জলস্পর্শ করা নিষেধ।

এরপর এক মাসের মধ্যে আবু কুথুই, লাম্প্রা পূজা দিয়া শুদ্ধ করিতে হয়। কেহ কেহ, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অথবা আবুকুথুই শুদ্ধকালে নাম করণ করে। বার, মাস বা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নামকরণ করা হয়। যেমন রবিবারে

জন্ম হইলে ''রইবাতি''বা ছেলে হইলে রবিরাই, নামকরণ করা হয়। পৌষ মাসে জন্ম হইলে পুষাতি, পুষরাই, যুদ্ধের সময় হইলে যুদ্ধমনি, নষ্ট মদ জন্মের সময় খাওয়াইলে ''চবাক হাময়াতি,''নামকরণ করা হয়। অচাই ও গুমাচুক বা গুমাজুক নামকরণ করে।

অচাইকে কার্য্যভেদে নাম রাখা হয় যেমন যে অচাই ঔষধ তৈয়ার করে, মন্ত্রে ঝাড়ে, কবচ দিয়া রোগীর চিকিৎসা করে তাহাকে বলা হয় বৈদ্য। যে ভান বা দিয়ারী গাজা উঠে, তাহাকে বলে ''মীতাই কানাই''। রোগীর রোগ নির্ণয় উদ্দেশ্যে মন্ত্রে মোহিত হইয়া সংজ্ঞাহীন ভাবে কি হইয়াছে বলিয়া দেয়। এই ভাবে অচাই, বৈদ্য, দিয়ারী, তীয়নাই- নায়, বলা হয়। যে সম্পূর্ণ অচাই বিদ্যায় পারদর্শী সেই রূপ অচাইকে বলা হয় অচাইয়ুং বা অচাইযুং। মগ, চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিলেও রোগমুক্তির কামনায় পার্বত্য দেবদেবী পূজা করে, কবচ মন্ত্র ধারন করে। চাকমা বৈদ্য, মগ বৈদ্য তান্ত্রিক চিকিৎসায় খুবই দক্ষ। মন্ত্রে তন্ত্রেও পারদর্শী। লতাপাতার গুণ যাচাই এ সিদ্ধ হস্ত। তাই বটিকাদি তৈয়ার করিয়া তাহারা রোগের চিকিৎসা করে।

মন্ত্র তন্ত্র, কবচ প্রয়োগ, লতাপাতার গুণে রোগ নিরাময় হয় উপজাতীয় জনগণ তাহা গভীরভাবে বিশ্বাস করে। পূর্বে দুর্গম পার্বত্য পল্লীতে যখন ডাক্তারের চিকিৎসার সুযোগ ছিলনা তখন বৈদ্যের চিকিৎসাই একমাত্র রোগমুক্তির ভরসা ছিল। উপজাতীয় জনগনের মনের সর্বাংশ জুড়িয়া ঐ বিশ্বাস এখনও অটুট আছে। কেহই হাসপাতালে চিকিৎসা করাইতে সহজে চাহে না। বৈদ্যের নিকটই প্রথমে চিকিৎসার জন্য যায়। এখনও বৈদ্যের চিকিৎসা সর্বত্র চলিতেছে। কিন্তু সকল অচাই সকলরোগের ঔষধ মন্ত্র ও পূজা বিধি জানে না। কেহ একটা রোগের ঔষধ জানে, অন্য জনে অন্যরোগের ঔষধ জানে যাহা জানে তাহা অন্যকে সরাসরি শিখাইতে চাহে না মন্ত্রতন্ত্র ঔষধ গোপন রাখা গুরুর আদেশ। তান্ত্রিক বিদ্যা গুহ্যবিদ্যা, এইসব কারণে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভে অন্তরায় হইতেছে। কিন্তু সকলেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। এই অচাইবিদ্যা সংগৃহীত ও উন্নত হইলে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিকিৎসালয় স্থাপন সম্ভব, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা হয় নাই। দিন দিন অচাই বিদ্যা লুপ্ত পাওয়ার পথে। প্রাচীন কালে অচাইগন যাদুমন্ত্র ও অলৌকিক ক্ষমতা বলে যেরূপ বলীয়ান ছিল তাহা আর নাই। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর লোক এখনও দৈব বলকে বিশ্বাস করাতে বাস্তব ও

বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির উপর বিশেষ আস্থাশীল নয়। যাদু বলে 'বলাগামা' নামক এক রমণী গোমতী নদীর জল বাঁধের নিমিত্তে আটকাইয়া রাখে, শুষ্ক বালুচরে হোসেন শাহের সৈন্যগণ তাবু খাটাইয়া শিবির স্থাপন করিলে হঠাৎ ভাসাইয়া বিপদাপন্ন করে, তাহাতে সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, রাজমালায় একথা উল্লেখ আছে।

শপথ গ্রহণই বিচারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদি কেহ কাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে দোষীব্যক্তি শপথ করিলেই সন্দেহদায় হইতে মুক্ত হয়। কথিত, একদিন শ্বশুর ৩০০ টাকা বালিশে রাখিয়া শিয়রে করিয়া ঘুমাইয়া ছিল, উহা হারাইয়া গেলে পুত্র বধুকে সন্দেহ করেন। তাহাতে শপথ গ্রহণ করার জন্য বিচারে সিদ্ধান্ত হইল। কালীপূজা করিয়া বলি বধ্য পাঁঠার লেজ ধরিয়া পুত্র বধু শপথ করেন যে উক্ত টাকা যদি গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে মা কালী তাহাকে অমঙ্গল করিবেন। এই আচরণে পুত্র বধু চোর সন্দেহ হইতে দায়মুক্ত হয়। ঘটনা কৈলাংসিং নামক স্থানে রাইমা নদীর উৎস স্থলে ভগীরথ রোয়াজা পাড়ায়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘটনাটি ঘটে ছিল। আমি ঐ গ্রামের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে অমরপুর প্রজেক্টের অধীনে শিক্ষক ছিলাম।

এই শপথের পর বিয়াই ও পুত্র, পুত্র বধু শ্বশুরের বাড়ী চিরতরে ত্যাগ করেন। আর আত্মীয়তা সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চিরতরে চলিয়া যান।

সারা রাজ্যে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ঔষধ, কবচ ও মন্ত্র জানা লোক ইতস্তত: ছড়াইয়া আছে। কিন্তু ঐ সব চিকিৎসায় আরোগ্য হয়না বা নির্ভর যোগ্য নহে, তাহা নহে। তন্ত্র মন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ কৌশলাদি করায়ত্ত করা সহজ নহে। কারণ প্রায় ঐসব মন্ত্র জানা লোক উচ্চ শিক্ষিত নহে, সংকীর্ণ ভাবাপন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বটে। আদিম ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী সমাজ অনুন্নত ভাবধারায় আটকাইয়া রহিয়াছে। উদারমনে জনসাধারণের উপকারের উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয় স্থাপন সম্ভব নহে।

কারণ - ১) জনগণ উচ্চ শিক্ষিত ও উদার ভাবাপন্ন নহে। সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর, লোভী ও হিংসায় কোন উপকার করিতে নারাজ। প্রতিবেশী সুলভ রেষারেষি ও পরশ্রীকাতর মানসিকতা সকলের মনোবৃত্তিতে দেখা যায়। নিজের পাশে স্বজাতীয় লোক ধনী মানী গুণী হইলে, গুণগ্রাহীত হয়না বরঞ্চ তাহার ক্ষতি সাধনে তৎপর, পারতপক্ষে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে সচেষ্ট হয়। এই জন্য উপজাতীয় সমাজে কোন আদর্শবান ব্যক্তিকে সম্মান্বিত ও খ্যাতি

সম্পন্ন করিয়া তোলা, এবং তাহার আদর্শ অনুসরণ করা একেবারে অসহ্য। কারণ তাহার জন্মগত মানসিকতা অসূয়া পরায়ণ। এইজন্য প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি কোন মহাপুরুষ, বা গুনী বলিয়া পূজিত ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুবরায় রাজা, দাংগাইমা দাংগায়ফা, বহু কথা শিল্পী, গান রচয়িতা, সাধক পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, উপজাতি সমাজে ছিল ও আছে কিন্তু অন্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা এই মহৎ গুণ কাহারো নাই। এই মানসিকতা বংশগত ও মজ্জাগত। এই রকম বহু মীরজাফর অন্ততঃ ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে আজও বর্ত্তমান।

অথচ জটিল রোগ লতাপাতার গুণে আরোগ্য হয়। সমাজে এখনও অনেকেই নিশ্চিতভাবে এই চিকিৎসা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল আছেন। যে রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহুল, তান্ত্রিক বিদ্যায় তাহা অনায়াসে আরোগ্য লাভ হয়। ১৯৯২ ইংরেজী সনের মে মাসে লাটিয়াছড়া নিবাসী শ্রীনরেশ দেববর্মার কন্যা, নাম শ্রীমতি আপাংতি দেববর্মা ও ঐ গ্রামের আরো একজন শ্রী উত্তম দেববর্মা আমার চিকিৎসায় পাগল রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে।

সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঐ বিদ্যা উদ্ধার করা সুকঠিন। নতুবা এই চিকিৎসা পদ্ধতি কোন অংশে কম নহে। ইহা ঝাড়া ফুকা, মন্ত্র ও জল পড়া কবচের গুণ। ঐ বিদ্যা গোপন রাখার নির্দেশ থাকায় সহজে উদ্ধার করা সম্ভব নহে। এই জন্য প্রতিষ্ঠান খোলা সম্ভব নহে।

অচাই এর রোগ দিশারী বা নির্ণয়ের কয়েকটি প্রণালী:-

গ্রহ দৃষ্টিতে জাতকের লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যু, রোগভোগ হইয়া থাকে, এই সত্যতা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। প্রতিটি বস্তুর আড়ালে নিহিত শক্তিকে এক এক দেব দেবী কল্পনা হিন্দু শাস্ত্রেরই বৈশিষ্ট্য। হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী কল্পিত হইয়াছে। অতীতে ভারতের লোকসংখ্যা দেবসংখ্যার চেয়েও কম ছিল। এখন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগণ সংখ্যা লঘু দেবগণকে আর মানে না, ভয় করে না। দেবদৃষ্টিতে রোগ উৎপত্তির বিশ্বাস শুধু উপজাতিদের বিশ্বাসে টিকিয়া আছে ।

অপদেবতা উগ্র। কুপিতগ্রহের চর হিসাবেই দশা ভোগ কালে রোগসৃষ্টি করে। জীবাণুও অপদেবতা বিশেষ। জীবাণু দলবদ্ধ জীব। ইহাদের মৌমাছির ন্যায় রাণী আছে। মন্ত্রে রানীকে বশীভূত করিতে পারিলে জীবাণু রোগীর দেহ ছাড়িয়া দেয়। সর্প, বাঘ, হাতী প্রভৃতি প্রাণী যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ও বশীভূত হয়।

কোনগ্রহের অপদেবতা কোন চর তাহা নির্দ্ধারিত আছে। যেমন

শনি গ্রহ কুপিত হইলে চর - কালী, ভদ্রকালী

রবিগ্রহ ,, ,, চর তৈবুকমা

চন্দ্র গ্রহ ,, ,, চর বণিরক

মঙ্গলগ্রহ ,, ,, চর হাকর, তৈবাখলাই

বৃহস্পতি ,, ,, চর কালাকতর, গড়েইয়া, যমদুগা, রাওখাল

শুক্রগ্রহ ,, ,, চর বুড়াছা,

রোগ নিরাময়ের জন্য গ্রহ বৈগুণ্য দোষ খন্ডনের জন্য কবচ ধারণ, রত্ন ধারণ, গ্রহ পূজা ও অপদেবতা পূজা এবং মন্ত্রে ঝাড়া দরকার। অচাই এই সব বিধি জানেন। অচাই এর সহযোগীকে 'বারুয়া' বলে। যাহারা বলি জীব খড়গস্থ করে তাহাকে বলে ''তানচরাই।'' স্ত্রীলোক কর্মীকে বলে জোগালী।

মাইখুলুম পূজা হয় শ্রাবণ মাসে। ধাণ্য ফসলের প্রণামী পূজা, ঐ পূজায় একজন কুমারী লক্ষী স্বরূপা হইয়া 'মাইনকমা' হয় ও পূজার ডালি বহিয়া পূজাস্থল হইতে ঘরে উঠায়। তখন কুমারী বালিকাকে লক্ষীজ্ঞানে ধান দূর্বা ফুল চন্দন দিয়া পা ধুয়াইয়া দেবাসনে বসায়, ধূপ দীপ জ্বালানো হয়। কুমারী পূজা হিন্দুশাস্ত্রে পবিত্র পূজা। বিবাহে ও তুইবুকমা পূজায় কেনজু, কেনজা নামে দুইজন শুদ্ধ বালিকা ও বালককে জলের ঘট বহন করানো হয়। এই বালক বালিকার মাতা পিতা, বিধবা বা মৃতদার হইলে চলিবে না। জীবনে প্রথম বিবাহ জাত সন্তান সন্ততি হওয়া বিধেয়।

(১) ভান বা গাজা:- মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চালান দিলে বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে আত্মা ভর করে। তখন ঐ ব্যক্তি মোহিত ও অচেতন হইয়া যায়। এই মোহিত অবস্থায় যাহা বলে তাহাই দেবতার বাণী ও বলিয়া বিশ্বাস করে।

কথিত আছে, বার্মাদেশে এক অপরূপ সুন্দরী বালিকা মাতৃহীনা হয়। তাহার পিতা তাহাকে লালন পালন করে। একদিন দূর হইতে মদমত্ত অবস্থায় তাহার পিতা নিজ কন্যাকে অপরূপ সুন্দরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাড়া করে। যুবতী পিতাকে চিনিতে পারিয়া সমুদ্র গর্ভে আত্মবিসজর্ন দেয়। সেই বিদেহ আত্মার নাম মংগিনী। গাজাতে এই মংগিনীর আত্মা হাজির করা হয়। ভর করা ব্যক্তি শুভাশুভ ব্যক্ত করে।

(২) ঘিলাদর্পণ ও নখ দর্পণ:-

নখে তৈল মাখিয়া অথবা ঘিলায় তেল মাখিয়া, দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলী একত্র করিয়া দেখিলে টেলিভিশনের মত বিভিন্ন দেবতার ক্রিয়াকরণের দৃশ্য মন্ত্রগুণে দেখিতে পায়। তাহাতে শুভাশুভ বলা যায়। এমন কি রোগীর জীবন মরণ বলিয়া দিতে পারে, উহা ছিল প্রাচীন রীতি ও বিশ্বাস।

(৩) বাটি চালান:- কবচ ঔষধ বাটির ভিতর দিয়া ধরিলে বাটি চলিতে থাকে কোন দ্রব্য হারাইলে ঐ দ্রব্যের সন্ধানে বাটি চালান দেওয়া হয়। অনেক সময় সন্ধান পাওয়া যায়।

(৪) খরি চালান:- খরি চালান ও অনুরূপ একটি বাঁশের দন্ডে খরি ঢুকাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ঐ দন্ড ধারণকারী ব্যক্তিকে নিয়া রোগ উৎপত্তিকর দোষণীয় স্থানের সন্ধান দেয়। ঐ সব দূষিত স্থানে পূজা দিয়া কবচ ও ঔষধ পুঁতিলে রোগ নিরাময় হয় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

অনেক সময় অযোগ্য অচাই রোগ নির্ণয় করিতে পারে না নিজে না পারিলে রোগীকে ডাক্তারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। অনুমানের উপর পূজা ও বনজ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিলে রোগ জটিল করিয়া তোলে ও রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেয়। রোগীকে শায়িত রাখিয়া মদ্যমাংস পানভোজন করিয়া অন্যের ক্ষতি করা উচিত নহে।

অনেক সময় হাতুড়ে চিকিৎসক অনুমানে ঔষধাদি প্রয়োগ করে। জলচর প্রাণী উথ্ মৎস্য ভোজী। মাছের কাঁটা গলায় আটকাইলে ঐ প্রাণীর জিহ্বা ঘষিয়া খাওয়ায় এইসব অনুমান ভিত্তিক ও নিজস্ব বিবেচনা উদ্ভূত, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

১৩) ফলাবাদ ও পরকালের ধারণা ও প্রবচণ

প্রায় উপজাতি সমাজের লোক 'ফলা' আছে তাহা স্বীকার করে। ফলা মানে আত্মা। তাহাদের আত্মাবাদ আর কিছুটা স্থূল ধরণের। শৈশব কাল হইতে প্রাচীন লোকের মুখে শোনা; মানুষ ঘুমাইলে তাহার ফলা কীটপতঙ্গ রূপ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই কারণে শিশু ঘুমাইলে কখনও প্রদীপের শিখায় আগত কীটপতঙ্গ মারিতে নাই, পাশে শিশুর ফলা মারা পড়ে। এই প্রসঙ্গে অনেক গল্প প্রচলিত।

ফলাবাদের গল্প:-

একদিন দুই বন্ধু বাজারে গিয়াছিল। দুইজনের মধ্যে একজন ছিল 'ছেকাল'। তাহারা দা কিনিতে গিয়াছিল সুতরাং কর্মকারের দোকানে আশ্রয় লইল। একপাশে কোনমতে শুইয়া উভয়ে নিদ্রাগত হইল। কামার কিন্তু রাত্রে ঘুমায় নাই কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

তখন এক মাকড়সা এক ফড়িংকে তাড়া করিতে করিতে কামারের নিকটবর্তী হইল। কর্মকার মাকড়সা ও ফড়িং এর মাঝখানে হাতের হাঁতুড়ি রাখিয়া এই দুই প্রাণীকে আলাদা করিয়া দেয়। মাকড়সাটি ছিল ছেকাল বন্ধুর ফলা এবং ফড়িংটি অন্য বন্ধুর ফলা।

সকালে দুই বন্ধু ঘুম হইতে উঠিল। কর্মকার তাহাদিগকে কেমন ঘুম হইল জিজ্ঞাসা করিল। তখন এক বন্ধু উত্তরে বলিল, ভাল ঘুমাইয়া ছিলাম, কিন্তু রাত্রে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যাহা মনে হইলে হৃদকম্প হয়। একটা বাঘ স্বপ্নে আমাকে তাড়া করিয়াছিল। মাঝখানে একটা গাছ ভাঙ্গিয়া পড়াতে রক্ষা পেয়েছিলাম। এই লোকটি স্বাভাবিক লোক।

আর এক বন্ধু বলিল - আমি স্বপ্নে একটা হরিণকে তাড়া করিতে করিতে, যখন ধরিতে পারিব মনে করিয়াছিলাম তখন একটা গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ইতিবৎসরে হরিণটি পালাইয়া যায়। কর্মকার তখন বুঝিল এই লোকটি ছেকাল। তখন কর্মকার ছেকাল বন্ধুর 'দা' ভাল ভাবে তৈয়ার করিয়া দিল আর অন্য বন্ধুর দা কিনারা ভাঙ্গিয়া দোয়াতা'যুক্ত করিয়া দিল।

দুইবন্ধু বিদায় হইয়া কিছুদূর যাওয়ার পর অন্য বন্ধুটি দেখিতে পাইল তাহার দা ত্রুটিযুক্ত, তখন উহা লইয়া সে পূনরায় কর্মকারের দোকানে ফিরিয়া গেল। কর্মকার দা এর ত্রুটি দূর করিয়া দিয়া বলিল তোমার সঙ্গী ছেকাল সাবধানে যাইবে। তারপর আসিয়া দুইবন্ধু মিলিত হইল ও পথ চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। কোন নিরাপদ আশ্রয় দরকার। আশ্রয় সন্ধান করিতে করিতে একটা পরিত্যক্ত জীর্ণ জুম ঘর দেখিতে পাইল। সঙ্গে চাউল তরকারী ছিল। কোন মতে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খাইয়া দুইবন্ধু শুইয়া পড়িল। ছেকাল বন্ধু নাক ডাকিয়া ঘুমাইল, অপরবন্ধু ঘুমাইল না। রাত্রি গভীর হইলে ছেকাল বন্ধুটির ফলা বাহির হইয়া জ্বলন্ত মশালের মত উড়িয়া গেল। তাহার দেহ পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা নরখাদক বাঘ আশ্রয়ের পাশে ঘুরিয়া গর্জন করিতেছিল, তখন নিরূপায় হইয়া ছেকাল বন্ধুর মুন্ডহীন দেহ ব্যাঘ্রের দিকে ঠেলিয়া দিল। বাঘটি উহা পাইয়া চলিয়া গেল।

ভোর হয় হয় এমন সময় ছেকোল বন্ধুর ফলা ফিরিয়া আসিল ও প্রবেশ করিবার জন্য নিজ দেহটি সন্ধ্যান করিতেছিল। তখন বন্ধুটি ছেকোল বন্ধুর হাবভাব বুঝিতে পারিয়া কলাগাছ কাটিয়া এক টুকরা কলাগাছ বাড়াইয়া দিলে ফলা তাহাতে ঢুকিয়া স্বাভাবিক রূপ ফিরিয়া পাইল। ছেকোল বন্ধুটি অন্য বন্ধুকে বলিল তুমি আমাকে বিলক্ষণ উপকার করিয়াছ, আমি পূর্বের রূপ ফিরিয়া পাইয়াছি তবে ভবিষ্যতে তুমি আমাকে ভুলেও কলাগাছ বলিবে না এবং এই কথা কাহাকেও জানাইবেনা। ইহার পর দুই বন্ধু নূতন উৎসাহে গ্রামের অভিমুখে পথ চলিতে লাগিল। অপর বন্ধুটি বলিল না - আমি কখনও সেইরূপ বলিব না। দুই বন্ধু চলিতে চলিতে নিজগ্রামে ফিরিয়া আসিল ও যে যার বাড়ীতে গিয়া নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রের সহিত মিলিত হইল।

দুই বন্ধু পাশাপাশি জুম কাটিল। ফসল বপন করিল। দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। ফসল ঘরে উঠিলে তাহারা উৎসব আনন্দে মেতে উঠল। আনন্দে দুই বন্ধু মদ্য পানে নানা কথা আলোচনা করিল। পরস্পর কথা কাটাকাটিতে তুমুল বাকযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের মাতামাতি ক্রমে হাতাহাতি। তারপর রাগে বন্ধুটি বলিল তোমার গোপন কথা অন্যকে বলিলে তোমার বিপদ হইবে। ছেকোল বন্ধুটি পূর্বকথা বিস্মরণ হইল, তার দম্ভ কমিল না, দম্ভ ভরে বলিল তুমি কি করিবে। তখন বন্ধুটি বলিল তুমি কলাগাছ বই আর কি! তখনই ছেকোল বন্ধুর দেহ কালগাছে পরিণত: হইল। এই খবর জানিতে পারিয়া তাহার স্ত্রীপুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটনাস্থলে দেখিতে আসিল, শত অনুরোধেও তাহাকে আর মানুষ করা গেল না - ছেকোল বন্ধুর ফলা অদৃশ্য হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া রহিল।

ফলাবাদগল্পে প্রবচন:-

একদা এক ব্যক্তি রাত্রে বিছানায় শুইয়া তাহার স্ত্রীকে জল খাওয়াইতে বলিল। কিন্তু গৃহিনীর কাজে কর্মে বিলম্ব হওয়ায় ঐ ব্যক্তি নিদ্রাগত হইল জল পান করা আর হইল না। ইতিবৎসরে গৃহিনীও ভুলিয়া স্বামীর পাশে শুইয়া পড়িল। ঐ ব্যক্তির তৃষ্ণার্ত্ত ফলা বাহির হইয়া এখানে সেখানে জলের সন্ধান করিতে লাগিল। তখন তাহার স্ত্রী ও স্বামীর পাশে শুইয়া নিদ্রাভিভূত হইল। ফলা জল খুজিতে খুঁজিতে - জলপূর্ণ কলসীর ঢাকনি ফাঁকে ঢুকিয়া জল পান করিল। কিন্তু ঢাকনির আড়ালে ঢুকিয়া আর বাহির হইতে পারিল না। ফলার রূপ ছিল একটা ফড়িং। ফড়িংটি কলসীর গলায় জলের কিঞ্চিৎ উপরে বন্দী হইয়া রহিল। ক্রমে প্রভাত হইল। স্ত্রী জাগিয়া শয্যাত্যাগ করার

পর তাহার স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখিল। তখন পাড়া প্রতিবেশীকে খবর দিল। সকলে আসিয়া মৃত দেহ সংকারের উদ্দেশ্যে উঠানে মৃত দেহ নামাইয়া দেহ ধৌত করিবার জন্য কলসীর ঢাকনি খোলা মাত্র, কলসী ভিতরের ফলা (আত্মা) মুক্তি পাইয়া দ্রুত উড়িয়া গিয়া মৃতদেহে প্রবেশ করিল। ইহাতে মৃত জীবিত হইয়া উঠিল।

মৃত জীবিত হইয়া উঠিলে সকলে ভয়ে পালাইল। কিন্তু মৃতের স্ত্রী পালাইল না, মৃতের নিকটে গিয়া স্বামীকে জল পান করাইল, ক্রমে সুস্থ করিয়া তুলিল। ইহার পর ঐ ব্যক্তি নাকি আরও বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া, স্ত্রীর সহিত পরমসুখে সংসার করিয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীরাও মৃত্যুর পর অন্যের মৃতদেহে আত্মা স্থাপনপূর্বক পুনরায় জীবিত হইতে পারে । এই সব সংস্কার ও প্রবচন শিশুদের মনে ফলাবাদের ধারণা সুদৃঢ় ভাবে গ্রথিত করে ও পুরুষানুক্রমে আবহমান কাল ধরিয়া এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

১৪) ত্রিপুরী সমাজে পরকালের ধারণা ও পরকাল সম্পর্কে প্রচলিত প্রবচন।

কোন ধর্ম নীতিতে মৃত্যুই মানুষের শেষ এই কথা বলা হয় নাই। যুগ যুগ ব্যাপিয়া জীবের অনন্ত জীবন এই কথা সর্বস্তরের দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন। প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরী সমাজের চিন্তায় ও কল্পনায় মৃত্যুর পর আত্মার সুবিধা অসুবিধা চিন্তা করা হইয়াছে।

সমাজে বংশপরম্পরায় এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি মরিলে তাহার ফলাকে (আত্মাকে) 'লবতি' নামক দেবতা মৃতের পথ প্রদর্শন করে।

তাই মৃত পাদমূলে একটি মোরগ ছানা আছাড় দিয়া বধ করিয়া ঐ মাংস মৃত ব্যক্তি ও লবতি দেবতাকে 'মাইখলাই' (বারান) দেওয়া হয়। ভাত - তরকারী মোরগ মাংস পাক করিয়া মৃত ব্যক্তির ফলাকে ও দেবতাকে, পৃথক পৃথক ভাবে দুইটা ডালিতে উৎসর্গ করা হয়। আজকাল এই মোরগ বধ করা উঠিয়া গিয়াছে বলা যায়। মোরগ না কাটিয়া জীবন্ত মোরগকে মৃতপাদ মূলে আছাড় দিয়া কেন মারা হয় তাহার সঠিক ব্যাখা করা সুকঠিন। আজ পর্য্যন্ত উহার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তথাপি ইহার তাৎপর্য্য আছে। একদিকে মৃত আত্মার বিদায়, অন্যদিকে লবতি দেবতার আতিথেয়তা উভয়ের খাদ্যের উদ্দেশ্যে উহা উৎসর্গীকৃত হয়।

সংসার নদী পার করিয়া ও উত্তুঙ্গ পর্বত আরোহণ করিয়া লবতি দেব মৃতের

আত্মাকে বিধির বিধাত্রী দেবী লারীমার নিকট পর্বত চূড়ায় লারীমাব মন্দিরে নিয়া যায়। লারীমার আদেশে 'কাইথর' লেখনি খুলিয়া দেখেন এবং মৃত আত্মার পাপ পুণ্যের বিচার করেন। ইহ কালের কৃত পাপপুণ্য কাইথরের লেখনিতে ধরা পড়ে। পাপপুণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফলে পুণর্জন্ম দিয়া আবার মর্ত্ত্যকুলে পাঠান হয় বলিয়া প্রাচীন ব্যক্তিদের কল্পনা ও বিশ্বাস।

মৃত্যুর পর পারে যে সুউচ্চ পর্বত আরোহণ করিতে হয়, ঐ পর্বতের নাম 'লকত্রাহাটুং'। উহা চারিস্তরে বিভক্ত। জীবিত কালে কোন ব্যক্তি, কোন জীবকে হত্যা করিলে ঐ জীব উল্লেখিত পর্বতে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বলিয়া কথিত আছে। সেইজন্য বধ্য জীবকে বলি দেবার সময়, অচাই এই মর্মে সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করে "হে বধ্য জীব, তোমাকে বধ করা সুবরায় রাজার রীতি অনুযায়ী কাজ। তাহাতে অচাই, বারোয়া কাহারো পাপ নাই। তোমার পাপ তোমার পুচ্ছাগ্রে বন্ধন করিয়া সঙ্গে নিয়া যাও"।

এই সব জনশ্রুতি ও প্রবচনে ভিত্তি করিয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পারলৌকিক আনুষ্ঠানাদি করা হইয়া থাকে, ঐ আচারের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের তীর্থ পর্য্যটন, অন্নদান, বস্ত্রদান, গাভীদান, পিন্ডদান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম অবশ্য করনীয় বলিয়া নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। এই সবের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের নীতির প্রভাব ও আছে। এ হেন দ্বিধা দ্বন্ধে বিভ্রান্ত না হইয়া পূর্ব পুরুষের ভাবধারার যুগোপযোগী সংস্কারই শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট পন্থা। বহু দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠানকে পার্ব্বণ হিসাবে পালন করিয়া সর্বশক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবের শক্তিতে আত্মসমর্পণ-ই দুঃখ ক্ষালনের প্রকৃষ্ট উপায়। সর্ব দেবদেবী মহাদেবেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ। মহাদেবের মন্দিরে মিলিত হইয়া ভজন কীর্তন, উপাসনা ধর্মালোচনা ও সাধু সঙ্গ ও কুনীতি সুনীতি গ্রহণ বর্জনের বিষয় আলোচনা করা যায়, ইহাতে সুফলের আশা সুনিশ্চিত। উপযুক্ত পরিচালক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অচাই চিকিৎসালয় পরিকল্পনা

ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী তান্ত্রিক চিকিৎসার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও আদর্শ চিকিৎসালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে অচাই দ্বারা রোগ চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে। এছাড়া রোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামবাসী জনগণ বর্ত্তমান যুগের ন্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা পাইত না। গ্রামে কুচিকিৎসায় ও বিনা চিকিৎসায়

অকালে মরিয়া যাইত। তবে কোন কোন অচাই, কোন বিশেষ রোগের চিকিৎসায় দক্ষ ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় চিকিৎসা করিত। বাণ তোনা ফিরানিতে, অপদেবতার, কুদৃষ্টি জনিত রোগে , এবং ঝাড়াফুঁকায় অচাই এর চিকিৎসা সুফল দিত। তবে এক অচাই এটা জানে, অন্য অচাই ওটা জানে। মন্ত্রতন্ত্র গোপন রাখায়, ঐ ব্যক্তির মৃত্যুতে ঐ বিদ্যাও লুপ্ত হইয়া যায়। অচাই বিদ্যা আজ প্রায় লুপ্ত প্রায়। কেহ কেহ সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দিয়া যায়। বর্ত্তমানেও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন বিদ্যা ছড়াইয়া আছে। ঐ সব বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া একত্র করা ব্যয় সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ। অচাই কমিটির মাধ্যমে, আন্তরিক প্রচেষ্টায় উহা সংগৃহীত হইতে পারে। কতিপয় প্রধান প্রধান রোগ বনজ ঔষধে আরোগ্য হয়। যেমন পাগল কুকুরের দংশন, সর্প দংশন, জন্ডিসরোগ সূতিকা, আরও অনেক রোগ দ্রুত ও নি:সন্দেহে আরোগ্য হয়।

বনজ ঔষধ সতেজ প্রয়োগ মাত্রই ক্রিয়া শুরু হয়, দীর্ঘদিন ঔষধ ব্যবহার প্রয়োজন হয় না, অচাই চিকিৎসায় অনেকেই সুফল পাইয়াছে যাহার ফলে আজও গ্রামবাসীর আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি সংরক্ষণের প্রয়োজন পাইবে সংরক্ষিত হইবে। এই অচাই বিদ্যা বা তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি কিভাবে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে উন্নয়ণ করা যায় ও সংরক্ষণ হয় উহার চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন।

অচাই বিদ্যা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপায়

(১) সর্বাগ্রে সক্রিয় ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে লইয়া একটা সফলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্মপ্রচেষ্টা চালাইয়া গেলে নিশ্চয় সুফল হইবে। যাহারা অচাই বিদ্যা জানেন এই রূপ ব্যক্তিগণকে নিয়া গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠন ও অচাইদের হাতে জন্ম মৃত্যু বিবাহ অনুষ্ঠানদির ভার দিয়া অচাই বিদ্যা সংগ্রহের অংশীদার করিতে হইবে দক্ষিণাদির মাধ্যমে আয়ের পথ সুগম করিয়া দিতে হইবে। জন কল্যানমূলক সঞ্চয় ও ফান্ড থাকিবে। তাহারা মন্দিরে ভজন কীর্ত্তন প্রার্থনা পরিচালনা করিবে। প্রতি অচাই অকুণ্ঠভাবে অচাই বিদ্যা সংগ্রহ কারীর সহিত সহযোগিতা করিবে ও নিজের বিদ্যা কৌশল দিয়া দিবে। তাহা ছাড়া গোপনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সান্নিধ্যে বিদ্যা সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। বার্ষিক সম্মেলনে সংগ্রহ করিতে হইবে ও কর্ম পদ্ধতি আলোচনা করিতে হইবে।

(২) পাঁচ কাণি বা ততোধিক পরিমিত ভূমিখন্ডে বা পর্বত গাত্রে অচাইদের

কর্মস্থল, গৃহ ও মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে। ঐ রূপ গৃহে উপাসনা ভজন কীর্তন পরিচালনা হইবে। ঐ ভূখন্ডে বনজ ঔষধের চাষ করা হইবে। সমাজ শিক্ষামূলক কার্য্য ও কুটির শিল্প এ প্রতিষ্ঠানে কাজ চলিতে পারে। বনজ ঔষধের চাষে টাটকা ঔষধ ফুল পাওয়া যাইতে পারে। ঝাড়া ফুকা মন্ত্র প্রয়োগে রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা, কবচ পাওয়ার ব্যবস্থাও থাকিবে। ঐ সব লতাপাতা শিকড়ের সাহায্যে উন্নতমানের ঔষধ তৈয়ার করিয়া রাখা যায়। বিক্রী করা যায়, চিকিৎসা করা যায়। চিকিৎসার সরঞ্জাম, উপাদান মজুত রাখিতে হইবে। গ্রহ শান্তির জন্য ও রোগ নিরাময়ের জন্য কবচ প্রস্তুত, সর্পদংশন, পাগল কুকুর কামড়ের চিকিৎসা, ব্যবস্থা রাখা দরকার। তাহা ছাড়া প্রসূতি চিকিৎসার ঔষধ মন্ত্র কবচ, শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা তেলপড়া, নুন পড়া সরিষাপড়া, জলপড়া, যাহা যাহা অব্যর্থ কাজ করে এরূপ উপাদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করিলে এই ঐতিহ্য বাহী চিকিৎসা পদ্ধতিতে উন্নত ঔষধাদি সংরক্ষিত করিয়া উন্নততর ব্যবস্থাপনায় তান্ত্রিক চিকিৎসা বা কবিরাজী চিকিৎসায় উন্নয়ন সম্ভব।।

১৫। সমাজ উন্নয়নে ভাষার গুরুত্ব ও ককবরক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা:-

ভাষা ভাবের বাহন, ভাষা দ্বারা সম্যক রূপে লিখিয়া পড়িয়া ভাবপ্রকাশ করিতে না পারিলে কোন উন্নয়ন মূলক কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ভাষার উন্নয়নকে বাদ দিয়া সমাজ উন্নয়নের আশা করা যায় না।

ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাধিক্য উপজাতীয় ভাষা হইল ককবরক। এই ভাষা উন্নয়নের ভিত্তি এখনও স্থাপিত হয় নাই। ককবরকে নিজস্ব লিপির প্রচলন নাই, বাংলা, বা ইংরেজী বর্ণমালা কোন লিপির মাধ্যমে লিখিয়া প্রকাশ করা হইবে তাহাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। লিপি সৃজন, বা লিপি নির্বাচন কোনটিই শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিতে না পারিলে সাহিত্য সৃষ্টির সূচনাই হইতে পারে না। যতটুকু যে যাহার খুশি, ইংরেজী বর্ণে বা বাংলা বর্ণে লেখা হইতেছে সেই সব সংগ্রহ করিয়া রাখার ব্যবস্থা নাই। কবি ও লেখকদের উৎসাহিত করার আয়োজন নাই। যে কোন পরিচিত ও অভ্যস্ত বর্ণে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়। যে কোন বর্ণে লেখা হউক না কেন তাহা শেষ সমাধান নহে, সমাধান হবে নিজের লিপিতে ধীর গতিতে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া। ককবরক পদ্যের ছন্দ কত প্রকার ও কি কি, কোন রসাত্বক তাহা স্থিরকৃত

হয় নাই। পরিভাষা তৈয়ার করা হয় নাই, বানান পদ্ধতি ও উচ্চাঙ্গের ব্যাকরণ ও রচনা পর্য্যায়ে গিয়া পৌছানো এখনও বহুদূরে।

ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, কলই, রূপিনী মুড়াসিং, নোয়াতিয়া, উচুই, সকলেই কক-বরক ভাষী। এই সব সম্প্রদায়ের জনগণ মিলিত ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ককবরক ভাষী হিসাবে সংখ্যাধিক। ককবরক ভাষার উন্নতি হইলে ত্রিপুরার অধিকাংশ উপজাতি অংশের মানুষের ভাষার উন্নতি হইবে। সম পর্যায়ের ভাষা অষ্টম তপশীল অন্তভুর্ক্ত হওয়ার পথে। দফা ভেদে উচ্চারণ ও সুর কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও ঐ পার্থক্য দূর করা সম্ভব। শ্রবণ মাত্রই কোন দফার লোক কথা বলিতেছে জানা যায় ও বুঝা যায়। কোন দফার উচ্চারণ আসল, না বিকৃত তাহা ব্যুৎপত্তি অর্থক্রমে নির্ধারিত হওয়া উচিত। এই সব বিচারে সকলের বোধগম্য শব্দ বানান সহ অভিধানে স্থান পাওয়া উচিত। শীঘ্রই অভিধান সংকলিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মৌখিক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে। এক দফার সহিত অন্য দফার উচ্চারন বিকৃতির বিশেষ নিয়ম আছে।

তাহা নিম্নে দেওয়া হইল

উচ্চারণ বিকৃতির নিয়ম:-

বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণমালার বর্গ অনুসারে প্রথম বর্ণ স্থলে তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন ক স্থলে গ, চ স্থলে জ, ত স্থলে দ হয়।

যেমন কেহ বলে কেন্দা (পুংশূকর) কেহ বলে গেন্দা।

,, কাইরেং (টংঘর)	,, গাইরেং
,, তকচলা (মোরগ)	,, তকজলা।
,, আচু (ঠাকুরদাদা)	,, আজু।

এইরূপ বিকৃতিতে, বডো, গারো, কাছারী ভাষায় বর্গের প্রথম বর্ণের অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটেছে। যেমন তৈ (জল) স্থলে দৈ। তক স্থলে দাউ। ক, চ, ত, প এর উচ্চারণ একেবারে নাই।

এই ভাবে উচ্চারণের পার্থক্য থাকিলেও একেবারে দুর্বোধ্য হয় না একে অন্যে নিজ নিজ ভাষায় ভাব বিনিময় করা যায়। রিয়াং, বডো কাছারী ভাষায় শব্দের অন্তস্থিত বর্ণ, স্বরবর্ণ হয় কিন্তু ত্রিপুরী উচ্চারণে শব্দের অন্তস্থিত বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ হয়। যেমন ত্রিপুরী উচ্চারণে কক্ রিয়াং উচ্চারণে কত্ত।

ত্রিপুরী উচ্চারণে তক (মোরগ) বডো উচ্চারণে 'দাউ' রিয়াং উচ্চারণে তউ

ইত্যাদি।

এখন কথা হইল এই সব নিয়মানুযায়ী ব্যাকরণাদি রচনা দরকার তারপর ভাষা রূপে প্রবাহ গতিশীল হইলে বই পুস্তক রচনায় সহজসাধ্য হইবে ও তবেই সমাজ সংস্কৃতি, ভাবধারা চিন্তা ধারার বিকাশ সম্ভব হইবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধ্যায়ত্ত হইবে। সুতরাং যাহার ভাব প্রকাশের মাধ্যম ও উপায় নাই তাহা কিরূপে উন্নয়ন সম্ভব হইবে। লিখিত রূপের সূচনা করিয়া সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে জাতির মূল্যবান উপাদানগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া সকলের গোচরীভূত করিতে হইবে। তাহাতে জাতির ভাবধারা প্রকাশিত হইবে। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ব্যতিরেকে জাতি উন্নত হইতে পারে না। সকলেই সাহিত্য ক্রমোন্নতির স্থায়ী পথ সুগম করিতে যত্নবান হওয়া উচিত।

ককবরক ভাষার কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

(১) অন্যকে করানো খাওয়ানো অর্থে বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়ার বিশেষ রূপকে প্রযোজক ধাতু বলা হইয়াছে। কক -বরকে এই অর্থে প্রথম বর্ণস্থলে দ্বিতীয় বর্ণ হয়। যেমন-

ককচলুই (ক্রিয়া) নিজন্ত ধাতু (অংরো)

(ক) কাগখা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । খাক -খা (বিচ্ছিন্ন করিয়াছে) ও কাগ স্থলে খাগ হইয়াছে।

(খ) কুগ খা- স্থলে / খুগ খা (উন্মোচন করা)।

(গ) কেঙ্খা -স্থলে / খেঙ-খা - (যে কেহ খুলিয়াছে)।

(২) কোন ফলা যুক্ত বিশেষণ পদ, ক্রিয়া পদে পরিণত হইলে ফলা উঠিয়া যায়।

(ক) যেমন- কৗপ্লা (ছিদ্রব) বিশেষণ, ক্রিয়া পদে হয় পা- খা, (ছিদ্র হইয়াছে) উপসর্গ কৗ উঠিয়া গিয়াছে।

(খ) কৗপ্রাব (লবণাক্ত) বিশেষণ। ক্রিয়া পদে হবে পাব - খা। কৗ ও রফলা উঠিয়া গিয়াছে ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

মন্ত্রতন্ত্র যাদুবিদ্যা

১। সুরিমুং (প্রার্থনা)

জয় জয় সুকুন্দ্রায় জগতনি বীসাই।
জয় মুকুন্দ্রায় ভবোনি য়াখ্রাই।।
মীতাই কাইচিব্রীই অঙখা যত বরক-নি,
য়ংসা কুগসা, তগমা তকসা হা-গ' তংনাই-নি।।
ক-গ' মাই রীনাই মীতাই আমা মাইলুং-মা
চাং-গ' রি রীনাই মীতাই আমা খুলুংমা।।
সাংগ্রংমা, মায়ুং করাই গাড়ীনি মীতাই।
হাচুকমা, হাচুক-গ' তংনাই বুড়াছা বীছাই।।
তুইবুক মা যতনি প্রাণ মীথাংগ' তুই-বাই!
খুলুম জাখা- মীতাই রক-ন' খা-বাই খুকবাই।।

২। সাধারণ দেব পূজায় উচ্চারিত সংকল্প বাক্য ও স্তুতি:-

(ক) কক-বরকে 'কুবেংমা'

''হাং-নাই, দং-নাই,
আঁহা হেই বাবুই (অমুক মীতাই) - রা-জা!
উত্তর-অ তংগয়-ব' দক্ষিণ অ তংগয় ব'
পূবে তংগয়-ব' পশ্চিম অ তংগয় ব'
হাসিকাম তংগয়- ব' হা ওয়ানজীয় তংগয়-ব'
ধ্যান অ, তংগয়-ব' দরবার -অ তংগয়-ব'
দরবার য়াককারয়, ধ্যান য়াক কারঅয়,
আচুক ফাইদি, বাচা ফাইদি
চা-মা, না- ফাইদি, নুংমা না ফাইদি,দকসাই।''

অনুবাদ:-

দেবতা আহবান:- '' হে অমুক দেব - রাজা, উত্তরে থাকুন, দক্ষিণে থাকুন, পূর্বে থাকুন, পশ্চিমে থাকুন,ধ্যানে দরবারে যেখানেই থাকুন ঐ কাজ ফেলিয়া পূজাতে এসে বিরাজমান হউন, পূজা গ্রহণ করুন।

(খ) পাত ফেলা- এক জোড়া কাঁঠাল পাতা হাতে লইয়া নিম্ন বাক্যে দেব আসিয়াছে কিনা পাতা ফেলিয়া দেখা, দুইটি একই পিঠ হইলে না বোধক, দুইটি পাতা একটা এপিঠ অন্যটি অন্যপিঠ হইলে হাঁ বোধক।

পাতকার মা - ''আচুকথা হিনখাই, বাচা খা হিনখাই
খকগয় মাতংয়া, হুই অয় মাতংয়া
লাইমা মিদি - লাইসা মিদি।
বামন সালে পন্ডিত সালে
পুঁথি নায় অ পাঞ্জা নায় অ

আং কমলা কমথা।
লাইমা নায়অ লাইসা নাইঅ
কাংসা বলব কাংসা মীথাল
দক সাই

ব্যাখা:- তুমি এসে থাকলে (পাতা সংকেতে) বল। ব্রাহ্মণে পন্ডিতে পাঁজি পুথি দেখে বলিতে পারে। আমরা কমলা-কমথা (অচাই বারুয়া) পাতজোড়া ফেলিয়া জানিতে চাই তুমি এসেছ কিনা!

(গ) লাইসা চায়া খাই:- পাত ঠিক না হইলে পুন: উক্তি,

(ক) লাই মা মিতৈ, লাইসা মিতৈ
মুনুই মুনুই আচুক খা
ব-নছে সা-গ', ব-নছে সীংগ'।
কাংসা মীথাল, কাংসা বলব, দকসাই!

(ঘ) চায়া খাই:- পুন: মন্ত্র

(ক) লাই মা দোষী, লাইসা দোষী
লাইমা সীলাইখা, লাইসা সীলাইখা
গুরু বক তৈ, বগয় রীখা
কাংসা বলবদি, কাংসা মীথালদি
দক সাই। দুহাই ঈশ্বর।

(ঙ) পাত চায়াখাই - পুন: মন্ত্র

আঁহা হাংনাই, দংনাই কুবুই
আচুক য়া খীলাই, বাচায়া খীলাই

গুরুনি হুকুম বাই, গুরুনি খুক তীয়বাই
গুরু বকতৈ বগয় রীখা, চংগয়- রীখা
দোহাই গুরুনি চা-মাসিং আনি
চা-য়া গুরুনি দোহাই গুরু
পাত কারদি-

গ, ঘ, ঙ এর ব্যাখা:- পাত সমান পিঠে পড়েছে, দেব। তুমি খেলিতেছ, হাসিতেছ রসিকতা করিতেছ।এখন সমস্ত তোমার জিজ্ঞাস্য বলা হয়েছে। হয়ত: পাতার দোষে দোষযুক্ত, আমার ডালি সাজান ভাল হয় নাই, বিধি সঙ্গত হয় নাই, কিন্তু সেটা আমার গুরুর হুকুমেই করা হইয়াছে সব গুরুর দোহাই আমার দোষ নহে।

(চ) **পাত চায়াখাই** -ঠিক না হইলে পুন: মন্ত্র পাঠ বচন।

বিছি, বিছি খালি খালি, ওয়ানসুগয়, তংনাই
ভাবেগয় তংনাই, বনছে সাগ’ বনছে হিনঅ
কাংসা মীথালদি, কাংসা বলবদি
দুহাই গুরুনি, গুরুনি দোহাই।

ব্যাখা:- পাতজোড়া ফেলিয়া বারে বারে ঠিক না হইলে, বলিতে হয় তুমি তুষ্ট হও,প্রতি বছর তোমার সেবায় আমরা প্রস্তুত আছি। তাহাতে সেই পূজা যেমন গড়িয়াদেব,প্রতি বছর পূজা করিতে হইবে। ইহাই দেব সংকেত। বলির রক্ত দেখিয়া হৃদপিন্ড দেখিয়া, মোরগের বহিরাগ্র ভাগ,চেঙ্গা, দেখিয়া, নাড়ীভুড়ির অবস্থা দেখিয়া উহার শুভাশুভ সংকেত অচাই ব্যাখা সহ বলিয়া দেয় উহা শুনিতে এক বোতল মদ দিতে হয়। সংকেত বাক্যের নাম ‘‘সেমা’’।

(ছ) বারে বারে পাত ফেলিয়া ঠিক না হইলে প্রথম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত স্তোত্র মুখস্থ বলিয়া পাত ফেলার বিধি আছে। কিন্তু বারে বারে না হইলে পূজা সামগ্রীতে দোষ ত্রুটি আছে বুঝিতে হয়। রোগী দুরারোগ্য হতে পারে বলে ধরা হয়। অনেক সময় রোগী মারা যাইবে বলিয়া মনে করা হয়। পাতা দোষযুক্ত জ্ঞানে পাতা বদলাইতে হয়।

(জ) হাময়া খিবি মুং- খোওয়া, দশা অশুভ বিসর্জন (কুবেংমা) স্তোত্র।

(ক) নীছা ফলনা (মুং) নাম (অমুক)
য়াক নি দা ফাল অই, চাংনি রি ফাল অই।
চামা রিখা, নুংমা রীখা, আসুক হিনখালাই

বিনি, হাময়া তং মানি, চায়া তং মানি, কুলুম তং মানি
কাঁসা তং মানি, সিলি তং মানি, বিলি তং মানি.
মাঁকলে তং মানি, কুংলে তং মানি, দশা তং মানি
মাপা তং মানি, খোয়া তং মানি, খুশি তং মানি,
ছিলি য়াক কারঅয়, বিলি য়াক কারঅয়
হাময়া তং মানি চায়া তং মানি।
হা নি বুসুব-অ, তাঁয়নি কানাঅ
সুগয় - তাঁলাংদি, রকগয় - তাঁলাংদি বল্লাই।

ব্যাখ্যা- তোমার পুত্র (অমুক) পরিধেয় (কোমরের বস্ত্র) বেচিয়া হাতের একমাত্র দা বিক্রি করিয়া তোমার পূজার অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়াছে, অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে কাজেই সমস্ত দায় মুক্ত কর- অমঙ্গল ধৌত করিয়া নিয়া যাও।

(খ) কবকমা (পরিবেশন) মন্ত্র:- স্তোত্র - তুমি এসে ডালিতে বসেছ। পদ প্রক্ষালন কর, তাহা হইলে, অর্ঘ নিবেদিত হইয়াছে তাহা তোমার সোনার থালা রূপার বাটিতে দিয়াছি, ভোগ কর (জল উৎসর্গ করিবে)।

লাহানবাই তৈ চেরদি।

আঁহা - য়াকসুদি, খুক সুদি,
আহা কুবুই আসুক হিন খাঁলাই
রাংচাকনি বাতি, রুফাই নি খুরি
য়াচাক গয় চাংদি, খুক চাক গয় চাদি
(লাহান বাই তৈচেরদি)
নরকনি অকপুংতৈ খাপুংতৈ, বিনি আয়ুক পুংগয়
থালুক পুংগয়, নুথুং পুংগয় হামঅয় তংথুন
চাঅয় তংথুন।

ব্যাখ্যা:- তোমাদের যেমন উদর পূর্ণ হয়েছে সেইরূপ জাতকের সর্ব পূর্ণ হউক।

নুথুং বাড়েথুন, মাই-রাং বাড়েথুন,
রাংখক বাড়েথুন রিতাঁং বাড়ে থুন,
বনছে সাগ, বনছে কুঅ, দকসাই ।

(সংসার বাড়ুক ঐশ্বর্য্য শ্রী বৃদ্ধি হউক, তাহাই তোমাকে বলা হইতেছে।)

(গ) মদ্য উৎসর্গ:- য়াক সুদি, খুক সুদি, চামা নাদি, নুংমা নাদি

চেবা কীথার বাই চুক্তি কীথার বাই

আওয়ান বাই খামচুই বাই বকগয় রীথা

চেংগয় রীথা।

ব্যাখ্যা:- হাত মুখ ধৌত করুন, আহার গ্রহণ করুন, পবিত্র মদ্য সহ, পবিত্র পিষ্টক খই সহ, অর্পণ করা হইয়াছে।

(ঘ) বলি (তানমুং) বধ্য জীবের প্রতি মন্ত্র উচ্চারণ । সম্বোধন। বলির বধ্য জীবকে নিম্নবাক্যে সম্বোধন করিবেন।

(১) পুন ন: হিনদি (ছাগকে সম্বোধন করিবে) শ্রী বাগবল, রাজা

(২) তক ন: হিনদি (মোরগ কে ঐ) শ্রী অনুপক্ষী রাজা

(৩) ওয়াক ন: হিনদি (শূকরকে ঐ) শ্রী বরাহ রাজা

(৪) ফারুক ন: হিনদি (কবুতরকে ঐ) শ্রী উড়ো পক্ষী রাজা

(৫) মিছিপ ন: হিনদি (মহিষকে ঐ) শ্রী ক্রংমালী রাজা

(৬) তাখুমন: হিনদি (হাঁসকে ঐ) শ্রী হংস বালেশ্বর রাজা

পাপ সুরকমানি কক (পাপ দায়মুক্ত বচন)

শ্রী বাগ বল রাজা। হর' আচাইঅ, হর' রাজাক গ,

সাল' আচাইঅ, সালঅ তানজাক -গ,

আংকমলা কমথা গুরুনি খুকতৈ বাই, সা-গ,

সুব্রাই চংঅয়ছে, বারোয়া বকগীয়ছে

নীমা চংঅয়ছে নীফা চংঅয়ছে

রানাই পাপকীরীই, অচাই পাপকীরীই

নিনি পাপন' নীং খিতুং খাগয় তৗলাংদি - বল্লাই।

ব্যাখ্যা: হে বাগবল, রাজা, রাত্রে দিনে যখনই জন্ম হউক তোমাদের আমি কমলা কমথা বলিতেছি, সুব্রাই রাজার বিধান -তোমার মাতা পিতা স্বীকার করেছে বধে, অচাই বারোয়া কেহই পাপে দায়ী নহে, তোমাদের পাপ তোমাদের পুচ্ছাগ্রে বাঁধিয়া নিয়া যাও। বালাই (অশুভ) নিয়া যাও।

''ওয়াথাইমা চক্রপয়া, খুঞ্জুমা বু-য়া, ক্রংমা বুয়া

বুথুই হামদি বখল হামদি।''

ব্যাখ্যা:- দাঁতে দাঁত খিচ্‌তে পারবে না, কান নাড়িতে পারিবে না। বলির রক্ত, অঙ্গ সকল শুভ লক্ষন যুক্ত হউক

দেবপ্রতি:- রাংচাক বাতি, রুফাই বাতি
য়াচাকগয় চাদি, ফন্‌সা ক্লাই ব'
আতু পুংনাই, থবছা ক্লাই -ব বাতি পুংনাই
অক পুংঅয় চাদি, খুক পুং অয় চাদি।

অনুবাদ:-

সোনার পাত্র ভরিয়া পান ভোজন কর, একখন্ড এক বিন্দুই যথেষ্ট যাহা পূর্ণতা হবে।

(ঙ) বিদায়:- বচন,
আহা চামা মানখা, নুংমা মানখা
অকপুংখা খা পুংখা, সুক্লাই লাংদি
রক খলাই লাংদি, অর' তাতাংদি, অর' তাচাদি
গিরি নুথুংনি বাহামজুক, তৈ খক না ফায়া - ন'
বল নানা, ফায়া-ন' রিনাই বারি রিসা বারি
নাংন, নরক নি দেশঅ নরক থাংদি, দকসাই।

ব্যাখ্যা:- আহা পান ভোজন পাইয়াছ, উদর ভরিয়া খাইয়াছ এখানে আর থাকিও না, তোমরা অশুচি হইবে নিজ দেশে ফিরিয়া যাও।

কুবেংমা

৩। তৌইবুক লবমানি - নদী বন্দনা

নদীতে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বন্দনা করিয়া পাঁঠা মহিষ বলি দেওয়া হয়, তখন পূর্বোক্ত কুবেংমার ন্যায় তবে সুর পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়। রিয়াংদের এই মন্ত্র উচ্চারণ সুর আরও সুশ্রাব্য।

নদীবন্দনা
আঁহা ব্রীই, আঁহা ব্রীই আঁহা ব্রীই
শ্রী মা গংগি, আমা তৌই বুকমা
হাসিকাম কবংগয় হা উন-জৌই কাথন অয়
কেবেং ফুলেলে

কসং লকলেলে
দরবারঅ তং অয়-ব'
দরবার য়াক কারঅয়
ধ্যান অ তংঅয়ব
ধ্যান য়াক কারঅয়
আচুক ফাইজাদি
বাচা ফাইজাদি
নীছা ফলনা-
য়াকনি দা ফালয়ই
চাংনি রি ফালঅয়
চামা রিজাঅ
নুংমা রিজা অ
তীমানি বাগীই
বুমুং খুর পাই-লে
বীছা খুর পাইলে
চামা মান খীলাই
নুংমা মান খীলাই
ছিলি য়াক কারদি
রাংনি আয়ুক ন'
বকছাই ক্লাংদি
দকসাই!

অস্যার্থ:- মা নদী তুমি কুকি রাজ্যে শিয়র দিয়ে বঙ্গরাজ্যে পা রেখে দীর্ঘে দীর্ঘতম প্রস্থে সাদা প্রশস্ত হইয়া শুইয়া আছ। তুমি আসিয়া বস। যেখানেই থাক দরবার ধ্যান ছাড়িয়া আসিয়া বস। তোমার সন্তানের নাম স্মরণ কর কেন? তাই আজ সর্বস্ব দিয়া তোমায় পূজা করিতেছি আশীবার্দ দিয়া তাহার আয়ু সুরক্ষা কর।

৪। শিশু চিকিৎসার মন্ত্র

সরিষা পড়া মন্ত্র

(কাঁচা হলদি কাটিয়া সরিষার সহিত মিশাইয়া লইবে ও মন্ত্রে অভিমন্ত্র করিয়া লইবে। ছিটাইলে ও শিশুর বিছানা বালিশের তলে রাখিলে দোষ

কাটিয়া যায়।)

মন্ত্র:- নরশিং নরশিং কোন কোন নরশিং
কোন কোন জাতি হইল উৎপত্তি।
হুরুয়া জন্ম কথা কে দিল আনিয়া
গাছ হৈলে তেন তেনিয়া, নগুলা পাতা
নগুলা গোটা তারা কাঁপে, বসুমতী কাঁপে,
পাতালে বাসুকী কাঁপে, বীর হনুমান কাঁপে থরথর,
চারিকোনা পৃথিবী কাঁপে থর থর, এই জ্ঞান
নরে যদি ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ে ভূমে পড়ে
ফলনা পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর, ওঁ স্বাহা।।

শিশু কাঁদায় কালিপড়া

শিশু সন্ধ্যার সময় কাঁদে, থামে না, সাড়া রাত্রি কাঁদে, তখন রান্না পাত্রের নীচের কালি ঝাড়িয়া ৩ ফোঁটা শরিষা তেল মাখিয়া নিম্নমন্ত্রে অভিমন্ত্র করিয়া ডান হাতের কাঁর জোড়াতে, কনুই জোড়াতে কব্জি জোড়াতে তিন ফোঁটা, সেই রূপ বামহাতে তিন ফোঁটা এবং দক্ষিণ পায়ে জোড়া জোড়াতে তিন ফোঁটা, বাম পায়ে জোড়া জোড়াতে তিন ফোঁটা, কপালে এক ফোঁটা সর্ব মোট তের ফোঁটা কালির তিলক দিলে, মা কালীর আশীর্বাদে কাঁদা থামিবে। মন্ত্র গোপনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

মন্ত্র:- কালী কালী ভজিব কালী
কালী পড়া সুরমা সুর
কালী পড়া শিজি মাংজি
কৈলাম দূর।

লাখা মন্ত্র:- কাল সুতা সাতগাছি লইয়া পাকাইয়া সাত গিরাতে সাতবার মন্ত্র পড়িয়া শিশুর গলায় পৈতার মত জুড়িয়া দিবেন। বাম কাঁধে উপরে ডান বগলের নীচে যেন থাকে।

মন্ত্র:- ওঁ ঠাট্টা বজ্র নরশিং বন্দন বন্দন ওঁ স্বাহা।

শিশুর উদরাময়:-

শিশুর সাত আটমাস বয়সে দাঁত উঠার সময় হলদে বা সবুজ মল নি:সরণ

করে বারে বারে কয়েকদিন ব্যাপী পেটের অসুখে ভোগে। দীর্ঘদিনে ভাল না হইলে চক্ষু অন্ধ হয়। অনেক সময় শিশু মারা যায়।
''ঝুনা নারিকেল বাঁটিয়া রস খাওয়াইবেন এবং ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। কলেরা বটিকা খাইবেন। চুক্তিমা বাটিকা।''

৫। প্রসুতির পরিচর্য্যা:

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে প্রসব ত্বরান্বিত করার জন্য একটা বাটিতে তৈল লইয়া সাত বার নিম্ন মন্ত্রে পড়িয়া তলপেটে সরিষা তৈল পড়া মাখিয়া দিবে।

১) মন্ত্র:- সোনা দুলাইয়া দোলাইব
রূপা দুলাইয়া দুলাইব,
আগে আইল বড়ভাই
পিছে আইল ছোটভাই
আয় ফটলা আয়
শিগগীর আয় ওঁ স্বাহা।

২) সুখ প্রসব:- বেদনা ত্বরান্বিত করার জন্য লজ্জাবতীর শিকড় প্রসূতির চুলে বাধিয়া দিলে প্রসবের বেগ বাড়িয়া যায়।

৩) ''উল্টা লেংগ্রা'' শিকড় ডান উরুতে বাঁধিয়া দিলে সন্তান ও ফুল সবকিছুই বাহির হইয়া আসে।

৪) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ফুল না আসিলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটা রিষা বা গামছা অভিমন্ত্র করিয়া সাতবার ফুঁ দিয়া প্রসূতির স্তনের নীচে ও নাভির উপরে বাঁধিয়া দিবেন। একটা গামছার একপ্রান্ত ধরিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাতবার অভিমন্ত্র করিবেন। তাহাতে ফুল নামিয়া আসিবে।

মন্ত্র:- ক্রাঁইফু -বাউ, ক্রাঁয়ু সাইতে
ক্রাঁইয়া বাউ ক্রাঁইফু সাইতে
নাইথু লেথু লেথু
খোওয়াং লেস্রা খোওয়াং ॥

৫) গর্ভাবস্থায় দিবসে ঘুমাইলে বা অন্য কারনে গর্ভবতীর সূতিকা রোগ হয়। পা ফুলিয়া যায়, রক্ত শূন্য হয়, তখন রক্ত শূন্যতার জন্য খুম মাকাই বা মাকের শিকড় খোসা ছাড়াইয়া জলে ভিজাইয়া ঐ জল খাওয়াইবেন।

'জুম্মা থাকতৈ য়ারুং' কবচের খোলে ঢুকাইয়া কোমরে ধারণ করাইবেন।

৬) মৈ ছায়া বিথি: ইহার শিকড়ের খোসা ছড়াইয়া পান সুপারী সহ মিশাইয়া খাইলে যেকোন শাক সব্জী খাওয়া যায়। তথাপি প্রসূতিকে গন্ধহীন চাউল অভ্যাস অনুযায়ী আতপ বা সিদ্ধ চাউলের ভাত খাওয়াইবেন। বিশেষ ভাবে উত্তম চাউল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ভাজা লবন সহকারে প্রসূতিকে খাওয়াইবেন।
যতই দিন যায় ততই সহজ পাচ্য দ্রব্যাদি ক্রমে শাকসব্জী খাওয়াইয়া ঐ খাদ্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবেন।
বাথরুম না থাকিলে স্নান করার স্থান ব্যবস্থা করিয়া গরম জলে প্রসূতিকে স্নান করাইবেন।

৭) নাভি খসিয়া পড়িলে শিশুর নাভিতে চুল্লীর পোড়া লাল মাটি গুঁড়া করিয়া দিলে অথবা মাট্যা সিন্দুর লাগাইলে, ইহাতে নাভি শুকাইয়া যায়।
৮) উইতে রোগ:- শিশুর শরীরে লাল ফুস্কিরি বাহির হয় তাহাকে উইতে রোগ বলে। গাছের লাল উল অথবা তেলস: গাছের উল ঘষিয়া শিশুর জিহ্বায় লাগাইলে ঐ রোগ নিরাময় হয়।

৯) পাত্রে তুষ, ধানের তুষ রাখিয়া তাহা নিম্নমন্ত্রে সাতবার ঝাড়িয়া আল্যা ঘালাইয়া প্রসূতির ঘরে ধূঁয়া দিবেন।

তুষ অভিমন্ত্র:-
ওঁ কি কি গা, কিগা
ক্যাগা আঙ্গা ক্যাগা ভ্রক
ওঁ স্বাহা।

এই মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্র করিয়া প্রসূতির কামরায় তুষের ধূঁয়া দিবেন।

১০) রসসিন্দুর রসমাণিক্য পাথরে ঘষিয়া ঝিনুকের খোলে লইয়া শিশুর জিহ্বায় লাগাইবেন, ইহাতে শিশুর জ্বর ছাড়িয়া যায়।

১১) প্রসূতি মাতার বুকে দুধ না আসিলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্র করিয়া চাউলের পিঠা গুড়া জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিয়া প্রসূতিকে খাওয়াইবেন।

মন্ত্র:- হাত ছড়া পানি, হাত গরু দুধ
ফলানী অঙ্গের দুধ ঝড়ঝড়িয়া পড়
ঈশ্বর মহাদেবের দোহাই ওঁ স্বাহা

ঔষধ:- খুমতকতৈ শিকড় তুলিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া রসুন-গুলমরিচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইবেন তাহাতে বুকের দুধ আসিবে।

দুধ বাড়ে

অনেক সময় প্রসূতির বুকের দুধ বাড়ে, ঐ স্তন দুগ্ধ পানে শিশু ঘন ঘন মলত্যাগ করে ও পেটের অসুখ হয়।তখন নিম্নমন্ত্রে স্তন ঝাড়িবেন:-

মন্ত্র:- দুধু বাড়ে, দুধু বাড়ে
দুধু ছিড়া ছিড়ি, ফলানী দুধু বাড়ে
দুধু নামিয়া যা দুধু ছাড়িয়া যা।
সকাল সকাল তিন সকাল তিনবার ঝাড়িবেন।

সূতিকা রোগ :-

রাম থাইচুক শিকড় উত্তমরূপে জলে ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া ঐ বাকল রসুন গুলমরিচ দিয়া বাটিয়া প্রসূতিকে তিন সপ্তাহ খাওয়াইলে সূতিকা রোগ নিরাময় হয়।

অথবা

চুক্তিমা শিকড় উত্তমরূপে জলে ধুইয়া বাকল ছড়াইয়া ঐ বাকল রসুন গুলমরিচ দিয়া বাটিয়া মটর দানা পরিমান বটিকা তৈয়ার করিয়া সকালে দুইটি বটিকা ও বৈকালে দুইটি বটিকা তিনদিন খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। মোট ২১দিন খাইতে হইবে।

বুকের দুধ না আসিলে :- বুকের দুধ না আসিলে আতপ চাউলের গুড়া জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিয়া নিম্নমন্ত্রে সাতবার পড়িয়া প্রসূতিকে খাওয়াইবেন।

মন্ত্র:- ''অগর ছ্য়া মগিনী পানি
সুর পৈথামা গান্দ্রিমা জানি
(অমুক ফলনী) দুখুলে ভাঙ্গে
আইস্রা আই, মা চন্ডীকা নামে
সাত নাল খুলিয়া আয়,
বট বট ওস্তাদের দোহাই।''

স্তনে বাত:-

অনেক সময় স্তন ফুলিয়া যায়, টনটন করে তাহাকে বাসি বা বাত বলে। কুমারিয়া মৌমাছি তোলা মাটি। অনেক সময় ঘরের বেড়াতে মাটি দিয়া বাসা তৈয়ার করে ও মাকড়সা ধরে। ঐ মাটি জলে গুলিয়া স্তনে মাখিবে।

লতাপাতার গুনাগুন ও কয়েকটি প্রধান প্রধান রোগের চিকিৎসা:

৬। পাগল কুকুরের দংশন:

আমাদের দেশে ভাদ্রমাসে বেশী কুকুরের উপদ্রপ হয়। কারন তখন কুকুরের বংশ বৃদ্ধির সময়। কুকুর প্রভু ভক্ত এবং খুবই সহিষ্ণু। শত অপমানেও প্রভুর অনুগত থাকে।

যেসব কুকুর দুর্বল, কোন কুকুরের সহিত লড়াইতে এ জয়ী হইতে পারেনা, সকলের নিকট পরাজিত হয় ও কত চেষ্টা সত্ত্বেও কুকুরীর সহিত মিলন হইতে ব্যর্থ হয়, আবার খাওয়া দাওয়া ঠিকমত পায়না -ঐসব বঞ্চিত অবহেলিত কুকুর মানসিক দু:খে পাগল হইয়া যায়।.

পাগল কুকুর কামড়াইলে মানুষ, গরু, বাছুর -যেকোন জন্তু জলাতঙ্ক রোগ হয়। সময়মত চিকিৎসা না হইলে রোগী কুকুরের বাচ্চা প্রসব করে। নারী পুরুষ সকলেই বাচ্চা প্রসব করে ও মারা যায়। রোগী জলকে ভয় করে, পিপাসার্ত হয়। গায়ে ঠান্ডা বাতাস লাগিলেও ভয় পায়। মানুষ পাগল হয়, কুকুরের ন্যায় অন্যকে কামড়াইতে চাহে। কুকুরের মত আচরণ করে। জলাতঙ্ক রোগীর দুই তিন প্রকারের চিকিৎসা আছে। নিম্নে একটি চিকিৎসা পদ্ধতি দেওয়া হইল। ওস্তাদের দোহাই ইহা অব্যর্থ।

ওস্তাদ শ্রী ব্রজনাথ ত্রিপুরা পীং যামিনী ত্রিপুরা সাং রস্যা বাড়ী, অমরপুর ডিভিশন, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

ক) মন্ত্র:- ওঁ উনাপ ওঁ পনে সুওয়া
কংস পনিপনি মারিয়া দে বিষ

দিংশলে নিও বিষ আর শলে
বিষ ওঁ স্বাহা।

খ) চলন:- আতপ চাউল জলে ভিজাইয়া পাটাতে পিষিয়া রুটি মাখার মত করিয়া উক্ত পিষ্টক বালতি গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া উপরে (ক) নং মন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্র করিবেন। তারপর কুল বা বড়ই ফল আকারের বটিকা গুলিয়া দিনে তিনবার রোগীকে খাওয়াইবেন।

গ) জুমের কার্পাসের বীজ একুশটা হাতে লইয়া (ক) নং মন্ত্রদ্বারা বীজ অভিমন্ত্র করিয়া লইবেন। কার্পাসের বীজ পূর্বোক্ত পিঠা মাখিয়া দিনে তিনটা খাওয়াইতে দিবেন। এরূপে সাতদিন খাওয়াইবেন।

ঘ) ক্ষতের চারিপাশে পিষ্টক পড়া মাখিয়া দিবেন। মাখিবার সময় এমনভাবে মাখিবে যেন ক্ষতস্থান ঢাকিয়া বন্ধ হইয়া না যায়। বিষ ঝড়িয়া যাওয়ার জন্য ক্ষত মুখ খোলা রাখিতে হইবে। সাত দিন খাওয়াইলে ঈশ্বরের কৃপায় জলাতঙ্ক রোগ হইবেনা। ইহা নির্ভরযোগ্য ও ওস্তাদের পরীক্ষিত। ওস্তাদের মেয়েকে পাগল কুকুর কামড়াইয়াছিল । বর্ত্তমানে মেয়েটি সুস্থ আছে। মন্ত্র সব সময় গোপনে রাখিবেন, ওস্তাদের দোহাই।
কুকুর কামড়ের এক সপ্তাহ অবধি রোগী অস্বাভাবিক হয় না। যতই দেরী হয় ক্রমে ক্রমে উপসর্গ দেখা দেয়। মাসেকের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ প্রকাশ পায়।
কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ চাপা থাকিয়া নয়মাসের মধ্যে মরিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং পাগল কুকুর দংশনের পর যত শীঘ্র চিকিৎসা করা যায় তত ভাল।

৭। সর্প দংশন:
১) ঝাড়ার মন্ত্র:- বিষ ঝাড়া:
লামরে বিষ, ওরে ওরে বিষ। জনন্তর জাতি, লাতে লাতে বিষ, পাতালে নামিল বিষ, পাতালে বাসুকী নামে বিষ। নিতাই পদাঘরে তোমার বাপেরে খাই বিষ, চখেতে আসিল বিষ, ঝাড়েতে নামিল বিষ।
হিঙ্গলা পিঙ্গলা নারী সুষম্না মনসা করিল বিষ, লামরে বিষ লাম, লাম লাম বিষ , দোহাই বজরং বলীর দোহাই।

(হাতে পায়ে কামড়াইলে ক্ষতস্থানের উপরে শক্তভাবে মোট দড়ি দিয়া বাঁধিবেন)।

২) সর্পদংশনে জলপড়া:- ওঁ শালে মালে
হর বিষকোং হ্রী হ্রী
সর্পবিদ্যং বেলং
ওঁ নাগেন্দ্র দ্রুমং দ্রুমং অর্ঘটমং বালে
সহ্ ঠ ঠ ঠ।

একটি ঘটি জল লইয়া একুশবার অভিমন্ত্র করিয়া পান করাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৩) ''ওঁ নমো নীল কণ্ঠ বিশুদ্ধায়''

উপরের মন্ত্রে ২১ বার জল পড়িয়া খাওয়াইলে যদি বমি না করে তবে সে রোগী বাঁচিবে।

মোরগীর বাচ্চা দ্বারা সর্প দংশন চিকিৎসা:

সর্প কোন ব্যক্তিকে হাত পায়ে দংশন করিলে দংশিত স্থানের উপর শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধিবেন। বাঁধার উপরে বিষ উঠিয়া গিয়াছে বোধ হইলে তার উপরে আরও একটা বাঁধ দিবেন। তারপর বাঁধার নীচে ভাঙ্গা বোতলের টুকরা দিয়া কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবেন। ক্ষতস্থানে বা তার অতি নিকটে বোতল টুকরা দিয়া কাটিয়া ক্ষত স্থানের রক্ত বাহির হইলে ঐ ক্ষত স্থানে দেড়মাস কি দুইমাস বয়সের মোরগী বাচ্চা হাতে ধরিয়া মোরগী বাচ্চার গুহ্য ক্ষতস্থানে লাগাইয়া কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিয়া রাখিবেন। তাহাতে মোরগী বাচ্চার শরীরে বিষ চলিয়া আসিবে ও মোরগী বাচ্চা জিহ্বা বাহির করিয়া ঝিমাইয়া পড়িবে ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। তখন ঐ মোরগী বাচ্চাকে সরাইয়া খাঁচায় পুড়িয়া রাখিবেন। আর একটি বাচ্চা আগের ন্যায় ক্ষত স্থানে গুহ্য লাগাইয়া চাপিয়া ধরিবেন। এইভাবে ৫/৬টি মোরগী লাগাইলে বিষ নির্মূল হয়।

আমার ছেলে ১২ বছর বয়স্ক। একদিন রাত্রি দশটার সময় প্রস্রাব করিতে বাহির হইলে উঠানে তাহাকে সর্প দংশন করে ও অল্প সময়ে বিষে হাত ফুলিয়া যায় ও ঘামে ভিজিয়া যায়। মোরগী খাঁচায় ছিল। উপরোক্ত উপায়ে তাহাকে বিষ হইতে মুক্ত করা হয়। দিনের বেলায় সাপে কামড়াইলে ও মোরগী সহজে পাওয়া না গেলে এই উপায়ে বিষ ছাড়ানো অসুবিধা।

ঔষধের নাম লিপিবদ্ধ করিতে বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে ভাষা সংকট বোধ হয়। কারন এমন গাছগাছড়া আছে যে উহার নাম বাংলায় বা ককবরকে নাই।সেক্ষেত্রে লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তবুও নিম্নে ঔষধের তালিকা দিতে চেষ্টা করিলাম :-

শিজৌ বৃক্ষের বাকল ছাড়াইয়া লইয়া রসুন ও গুলমরিচ দিয়া অর্ধতোলা পরিমান রোগীকে প্রতি ১০ মিনিট পরপর অন্তত: তিনবার খাওয়াইবেন।

৮। মাতৃ রোগ ঝাড়া:

জন্ম হইতে এক বছরের মধ্যে শিশু নানা রোগে ভোগে। শিশু তাহার রোগ যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না। তখন চিকিৎসক লক্ষণ বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন। কচি শিশু ঔষধও খাইতে পারে না। তখন ঝাড়া ফুঁকা ছাড়া কোন উপায়ান্তর থাকে না।

মাতৃপীড়া:- শিশুর গায়ে জ্বর থাকে, হাত পা কাঁপে। থরথর কাঁপে চোখ সাদা করিয়া চোখ উপরে উল্টায়, দেখিতে অস্বাভাবিক হয়, তাহাকে মাতৃরোগ বলে। মাতৃরোগ আরোগ্য না হইলে মস্তিষ্কে দোষ পড়ে, ফলে পাগলও হইতে পারে, নির্বোধ ও হইতে পারে।

মাতৃরোগ ঝাড়া:

ছোট গামছা ভিজাইয়া মাথায় ঐ গামছা বাড়ি দিয়া ঝাড়িবেন।

মন্ত্র:- ওঁ তংগা সিজি, লউয়া সিজি,
মতাঙ্গী সিজি, আরাঙ্গা সিজি, আমুনা সিজি,
আরেঙ্গা সিজি, লোয়াচাঁই সিজি,
লকপ্রা চাঁই সিজি, রাওখাল সিজি,
দারুখা সিজি, আপ্রেং সিজি,
লকপ্রে সিজি, ম্রামা সিজি লাম বাবু
লাম চল বাবু চল, শিগীরচল
লাম বাবু লাম ওঁ স্বাহা।
এই মন্ত্রে সাতবার ঝাড়িবেন।

কবচ:- সিকাম লাম্বাক পশ্চিম দিকের শিকড় কবচের খোলে পুরিয়া গলায় ধারণ করাইবেন।

তীব্র জব্দ মাতৃ ঝাড়ন:
মন্ত্র:- ওঁ কাওয়া রুচি কাওয়া রুচি।
ওঁ দুরিকা দুরিকী,ওঁ লেতং
বাবু জাই থাং, জোয়াং গ্রি
তৃজা মৃজাং, ওঁ দূরে দূরে
চুহা পাইথাং সুহা।

দিলা মাতৃ ঝাড়ন:
মন্ত্র:- ওঁ চংছে চংছে।
ওঁ আইসাং জংমা ওঁলে চালে,
ফিস্রাফি, ওঁ স্বাহা।

হাতে ফুল ঝাড়ু বা ঘর ঝাট দেওয়ার ঝাড়ু হাতে ধরিয়া রোগী দেহ স্পর্শ করিয়া বারবার ঝাড়িবেন, তারপর নিম্নমন্ত্রে সিজি তাড়াইবেন।

সিজি তাড়ন মন্ত্র:- (ঝাড়ু হাতে লইয়া পা আছাড় দিয়া ঝাড়িবেন)
ওঁ নাইখালে নাইং
তাজা সিজি রংজ
ফিস্রা ফি, জাস্রা যা
ওঁ স্বাহা।

৯। কতিপয় সাধারণ রোগের প্রতীকার

(ক) কলেরা বা দাস্ত বমি বা ষ্ট্রং ডাইরিয়ার চিকিৎসা।

চুক্তিমা শিকড় তুলিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বাকলা ছাড়াইয়া ঐ বাকল রসুন ও গুলমরিচ দিয়া বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইবেন। মটর দানা প্রমান দুই বটিকায় দাস্ত থামিয়া যাইবে। লবন জন পান করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

(খ) মূত্র থলি পড়া:
প্রসব কালে প্রসূতির মূত্রথলি নড়িয়া বা কাৎ হইয়া যায় ও সর্বদা মূত্র প্রবাহিত হয়। তাহাকে মূত্র থলি পড়া বলে। পরিধান বস্ত্র ভিজিয়া যায়। সেইক্ষেত্রে ঔষধ:-
সোনালী বৃক্ষ বা হুনাইল গাছের বাকল ছড়াইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এই রস চিনি সহ সেবন করিলে ঐ দোষ নিরাময় হয়।

(গ) সিতাই ককমানি- (জরায়ু নির্গমন):
প্রসূতির অনেক সময় জরায়ুমুখ বাহির হইয়া যৌন দরজা আবদ্ধ হইয়া যায়। উহাকে সিতাই বলে।
পাহাড়ী মেয়ের কাপড় বুনার তক্তা বা থুরি দিয়া মন্ত্র পড়িয়া যৌনদ্বারে ঐ সিথাই চাপদিয়া প্রসূতি নিজেই ঝাড়িবেন।

মন্ত্র:- ওঁ থা পৈথা সিথাই থগ
নাপৈ নাপৈ লক ঢুক।

ঔষধ:- খুম মাইকাই য়ারুম তুলিয়া উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া বাকল ছড়াইয়া রসুন ও গুলমরিচ দিয়া বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইবেন।
শনিবারে খুম মাইকাই শিকড় ও কচ্ছপের মাথার কিছু অংশ কবচে পুরিয়া কোমরে ধারণ করাইবেন।
খুমচাক য়ারুম:
খুমচাক শিকড় ও গুনথু মাছ শুকনার কিছু অংশ তামা বা লোহার কবচ খোলে ঢুকাইয়া শনিবার অথবা মঙ্গলবার অথবা অমাবস্যাতে ধারণ করাইলে সুফল পাওয়া যায়।

(ঘ) বহুমূত্র চিকিৎসা:
১) লাল আঁখের রস, (২) সারুয়া গাছের বাকলের রস, (৩) চিনি চাঁপা কলা গাছের রস একত্র করিয়া চিনি মিশাইয়া সকালে ও বিকালে তিন সপ্তাহ পান করিলে ইহাতে বহুমূত্র রোগ নিরাময় হয়। (মাত্রা:- দুই চামচ সকাল ও বিকাল)।

(ঙ) আমাশয় রোগ ও অর্শরোগ চিকিৎসা:
১) পোম গাছের কচি পাতা, (২) নল কচি অংশ, (৩) বাতা লতের কচি পাতা মিশাইয়া রসুন ও গুলমরিচ দিয়া বাটিয়া খাইবেন।
নল বাঁশের কড়ুল সিদল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লবন দিয়া ভাতের সহিত খাইলে অর্শরোগ নিরাময় হয়।

(চ) জ্বর বিষ ঝাড়াঃ

ওরে ওরে বিষ জনন্তর জাতি,
আষাঢ় মাসে বিষের উৎপত্তি,
হিঙ্গলে পিঙ্গলে নানা সুষ্মাতে,
ডাইনে পথে ছাড়িয়া বাঁয়ে পথে চলি,
মানস আজ্ঞা পাইয়া লাম বিষ লাম।
নরশিং মন্ত্রে আশর ঝাড়া -
নরশিং মাতা, নরশিং পিতা, নরশিং গুরু দেবতা,
নরশিং নামে সিজি মাংজি থর থর কাঁপে।
দোহাই নরশিং।

এই মন্ত্রে বিছানা ঝাড়িবেন। ঘর ও হঠাৎ চমকিয়া উঠিলে, ভয় পাইলে ঝাড়িবেন।

(ছ) কালিকা মন্ত্রঃ- গাত্র রক্ষাঃ

এই মন্ত্রে জপ করিলে সর্ব অপদেবতা ভয় পায় ও দূরে পালাইয়া যায়। ইহা জানা থাকিলে কোন ওঝা বান মারিতে পারে না। এইমন্ত্রে তৈল পড়িয়া নিজের অঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় লাগাইলে সিদ্ধকাম হয় ও নিরাপদে থাকা যায়।

মন্ত্রঃ- কালী কালী মহাকালী
জয়কালী রক্ষা কালী, শ্মশান কালী সুরমা সুর।

মন্ত্রের উপর বিশ্বাস না থাকিলে ফলবতী হয় না। শব্দ শক্তিই মন্ত্র। দুইপক্ষে ঝগড়া বাধিলে শব্দ শক্তি দ্বারাই উত্তেজিত হয়, এমন কি মারা মারিতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। মনের উপর শব্দক্রিয়াশীল, তাহা মন্ত্র নয় কি?
উপরের মন্ত্র অব্যর্থ ও বহুমুখী ফল দান করে। ইহা দ্বারা গাত্র বন্ধন, বিছানা বন্ধন। ভয় পাইলে উক্ত মন্ত্র উচ্চারণে ভয় দূর হয়। বিপদে উচ্চারণে বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অচাই এরূপ মন্ত্র গোপনে রাখে। অন্যকে শিখাইতে রাজী হয়না।

(জ) মাতৃরোগ ঝাড়াঃ

মন্ত্র:- ওঁ তাঁই দুলে দুলে
বাবুনি প্রিয়াং প্রিয়াং
মান্যা মনুষ্য অঙ্গ তলে ন থাক
বঙ্গ তলে ন থাক, রহং তলে ন থাক
এই লঙ্কা ছাড়িয়া আর লঙ্কা যা
লাম বিষ লাম।
ওঁ চাহিং চাহিং চাতা কুংকাং
মৈজা মৈ, খোয়াং সা খোয়াং
রোয়াংসা রোয়াং, ডাকিনী যোগিনী
ভূতানি প্রেতনি বেগুনি, ডাইনেতে
আইলে ডাইনেতে যা, বামেতে আইলে
বামেতে যা এই লঙ্কা ছাড়িয়া আর
লঙ্কা যা, লাম বিষ লাম।

গুল মরিচ চাবাইয়া ঝাড়িবেন:-
গুলমরিচ পড়া:

ঝাড়ন মন্ত্র:- ওঁ সপ্ত সাগর, সপ্ত পাতাল দেহের মধ্যে বিরাজ করে,হিঙ্গলা পিঙ্গলা সুষম্না, কান্ডারী বায়ু কর স্থিতি। ওঁ পবন দুই চক্র মধ্য কর স্থিতি, সুষা কান্ডারী এই নাড়ী বিষ্ণু নিরঞ্জন। যমুনাতে স্থিতিকর বাতি বাতি, নিতি নিতি কর ওঁ সুহা।
উপরোক্ত মন্ত্রে তড়কা রোগী শিশুকে তালু, চোখ, নাক, কান, মুখ, হাত পা জোড়া জোড়া গুহ্যে, বুকে ও পিঠে ঝাড়িবেন।

তেল পড়া মন্ত্র:-
১) ব্রহ্মা বিষ্ণু ওঁ তিনভুবন
সাগর মধ্য সপ্তসাগর,
সপ্ত পাতাল দেহের মধ্যে বিরাজ করে
ঈঙ্গলা পিঙ্গলা সুষুম্না
কান্ডারী ছত্রিশ হাজার নাড়ী বাহান্ন নাড়ী

মনেতে স্থিতি কর

ওঁ দলীং।

২) ঈঙ্গলা পিঙ্গলা সুষম্না কান্ডারী দেহের মধ্যে বিরাজ করে ওঁ দলীং।

৩) তিন নাড়ী ঈঙ্গলা পিঙ্গলা সুষা উর্দ্ধ অধ:মধ্য দেহের মাঝে স্থিতি কর ওঁ দলীং।

৪) চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম, নানা শোভে দেহের মাঝে বিরাজ করে ওঁ দ্লীং।

৫) চক্ষুমধ্যে কালাচাঁদ করিতেছে ধ্যান ওঁ দলীং।(তেল মন্ত্রপূত করিয়া সর্বাঙ্গে মাখিবেন)।

১০। পাগল চিকিৎসা

অনেক সময় শত্রুতা বশত: ঔষধ প্রয়োগে মন্ত্রের করণে একে অন্যকে পাগল করে।শিশুকালে মাতৃ আশর আরোগ্য করিতে না পারিলে নির্বোধ ও পাগল হয়। পাগলের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তাঘাটে পথে পথে পাগল রোগী দেখা যায়। অনেকে মানসিক দু:খে মানসিক ভারসাম্য হারায়, পুত্রশোকে, স্বামী বিয়োগে অনেকে পাগল হয়। পাগল চিকিৎসা খুবই জটিল ও কষ্ট কর।

পাগল কয়েক প্রকারের আছে।

১) এক প্রকার পাগল চীৎকার দিয়া অজ্ঞান হইয়া যায় মুখে ফেনা বাহির হয় ও মোহিত হইয়া যায় ঐ জাতীয় পাগলকে 'ওয়াকরু' বা মৃগী বলে।

২) পরী আসর পাগল:- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বাঁশী বাজায়, গাছে চড়ে ও আবুল তাবুল বলে গান গায় এইরূপ পাগলকে পরী আসর পাগল বলে।

৩) নাড়ী আশর পাগল:- আবুল তাবুল করে ছুটাছুটি ও ব্যস্ততা, মারিতে চায়, সর্বদা মেজাজ খারাপ, অনেক সময় পালাইয়া যাইতে চাহে।

৪) ভূত আসর পাগল:- অপরিষ্কার থাকে কাপড় চোপড় ময়লা, অখাদ্য কুখাদ্য খায়, কথা বলেনা। আপন মনে পথে পথে চলে কখনও কাঁদে - এরূপ পাগল ভূত আশর পাগল।

৫) অনেক সময় দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে শরীর ময়লা দুর্গন্ধ যুক্ত হয়, জীর্ণশীর্ণ হয়, ভূত ভয় করে। বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, কিন্তু খাওয়ার জন্য হাহাকার করে। মাছ মাংস খাইতে চায় ভিড় ভিড় করিয়া কি যেন বকে। ঐ অবস্থায় ভূত না ছাড়াইলে রোগী মারা পরে।
ঔষধ ও কবচ লিপিবদ্ধ করা অসুবিধাজনক , শুধু কয়েক ঝাড়া উল্লেখ করিতেছি।

নাড়ী আশর পাগল:

নিম্ন মন্ত্রে নাড়ী আশর পাগল ঝাড়িবেন:-

১) তালুতে ঝাড়ামন্ত্র: ওঁ ওঁ আমিলংচবরি শির মেলং সার থিই থিই সার কুমিলা স্বাহা। (সাতবার)

২) দুইবার চক্ষু ঝাড়িবেন- মন্ত্র:
ওঁ চক্ষু সূরয্য নিল বরকায়া বীর সেরে থিতি থিতি স্বাহা।

৩) দুইবার কর্ণে ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- ওঁ সর্ব্ব চন্দ্র নিরবায়ু, সর্ব্ব সারিলং ক্লীং স্বাহা।

৪) দুইবার নাকে ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- ওঁ ওঁ পঞ্চ বায়ু স্বাহা, সোহা দ্রীঁ দ্রীঁ স্বাহা।

৫) একবার মুখে ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- মুখেতে আল্লাজিহ্বা, কায়া গঙ্গাজল জ্ঞানে বসি থিতি ব্রিঁ ব্রাঁ স্বাহা।

৬) গলাতে একবার ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- ওঁ বিলে বিলে স্রালে
ক্লীঁ স্রা ক্লীঁ ওঁ স্বাহা।

৭) বুকে একবার ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- চৌরাশী ক্রোশ বৃন্দাবনে
দমদম সর্বাঙ্গ স্বাহা।

৮) নাভীতে একবার ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- নাভী মূলাধার সুষমা পিঙ্গলা
সর্বঅঙ্গ বিরাজ কর ওঁ স্বাহা।

৯) ডানহাতে একবার ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- ওঁ ওঁ ঈঙ্গলা পিঙ্গলা

ওঁ ইরাকে গঙ্গা স্বাহা।

১০) বামহাতে একবার ঝাড়িবেন:
মন্ত্র:- ওঁ নম নম: পিঙ্গলাকে যমুনা
সুষাকে সরস্বতী
দ্রীঁ দ্রীঁ স্বাহা।

নাড়ী আশরে জল পড়া সাতবার পড়িয়া খাওয়াইবেন:
মন্ত্র:- ১) চূড়ামধ্যে চূড়ামনি ব্রহ্ম পাশে স্থিতি ওঁ নম:
২) পাদমধ্যে মহাবিষ্ণু করেন বসতি হ্রীঁ ক্লীঁ।
৩) চক্ষুমধ্যে কালাচাঁদ করিতেছে ধ্যান ক্লীঁ শ্রীঁ ।
৪) নাসিকাতে নিত্যানন্দ মধুকরে পান শ্রীঁ হ্রিঁ ক্লীঁ।
৫) কর্ণেতে চৈতন্য মাসাক্ষি হয়ে সাবধান ঐঁ হ্রীঁ।
৬) মুখেতে দ্রাক্ষ বসি বত্রিশ যোগান দ্রীঁ।
৭) জিহ্বাতে নারদ মুনি বাজায় কোন্দল ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা।
৮) জিহ্বা নীচে বসে নদী কায়াগঙ্গা জল দর্লীঁ স্বাহা।
৯) আল্লাজিহ্বা সরস্বতী বামেতে শ্রীদাম দ্রীঁ ল্লীঁ।
১০) কণ্ঠদেশে শ্রীকানাই বাহুতে বলরাম শ্রী স্বাহা।
১১) হস্তমধ্যে শ্রী গোবিন্দ দান অধিপতি ক্লীঁ কৃষ্ণা ওঁ।
১২) সপ্তদীপে জগন্নাথ করেন বসতি শ্রীঁ ওঁ নম:।
১৩) নাভীমুলে ব্রহ্ম সদা করিতেছে লীলা শ্রীঁ দ্রীঁ।
১৪) লিঙ্গে মহাদেব বসে লয়ে চন্দ্রকলা হ্রীঁ লাঁ।
১৫) হাটুতে সতীর স্থিতি বসুমতি পায় দ্রীঁ দ্রীঁ স্বাহা।
১৬) ঐ ফলনা সর্বঅঙ্গে নাভিমূলে তেজ বায়ু
আকাশ শব্দ, স্পর্শ, শান্তি ওঁ স্বাঁহা।

শারণ মন্ত্র:

যেকোন বান মারা তোনামারা ফিরাইবার কৌশল মন্ত্র:

সোয়াসের চাউল দিয়া দুইটি কলাপাতার অগ্রভাগের ডালি সাজাইতে হইবে। চাউলের দ্বারা মূর্ত্তি বা কায়া,নূতন ছোট কলসী লইয়া ও একটি ঘটি লইয়া স্রোতস্বিনী নদী হইতে নিম্নদিকে মুখ করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া জল

তুলিবেন। কলসীর নীচে পাঁচহাত সাদা কাপড়ের আসন দিবেন। কলসীর নীচে পাঁচ টাকা, ঘটির ভিতর এক সিকি পয়সা দিবেন। জলপূর্ন কলসী পাঁচ হাত সাদা কাপড়ের আসনে বসাইবেন। ডানদিকে জলপূর্ন ঘটি চরকার তক্কা দিয়া এক বার মন্ত্র পড়িয়া মূর্ত্তির গলা কাটিবেন। ডানহাত বাম হাত ও পরে ডান পা বাম পা কাটিবেন।

মূর্ত্তির গলা ১ বার কাটিবেন।
ডান হাত ১ বার ''।
বাম হাত ১ বার ''।
ডান জানু ১ বার ''।
বাম জানু ১ বার ''।
বুক ১ বার ''।
তলপেট ১ বার ''।
মোট ৭ বার কাটিবেন (মন্ত্র সাতবার পড়িবেন)।

উপাদান:- ১ কেজি আড়াইশ চাউলের মূর্ত্তি।
১) নূতন কলসী ১টি।
২) সাদা কাপড় ৫ হাত আসন ১টি।
৩) পাঁচ টাকা কলসীর নিকট রাখিবেন।
৪) পঁচিশ পয়সা ঘটের ঘটির ভিতর দিবেন।
৫) ১ জোড়া ১ হাত পরিমান কলাপাতার অগ্রভাগ।
৬) সাদা সুতা ৭ গাছি।
৭) চরকার তক্কা পুরাতান ১টি, অভাবে কাছি পুরাতন।

সাতগাছি সাদা সুতা চক্রাকারে পাকানো কলসীর গলায় ও রোগীর গলায় জুড়িয়া দিবেন।

মন্ত্র:- দোহাই ব্রহ্মা যে জন মারিল বান
কেঞ্চি বান উল্টাফিরে তারে মারি খাও
যেজন মারিল বান।
ইন্দ্রাবান উল্টাফিরে তারে মারি খাও
যেজন মারিল বান - ব্রহ্মা বান উল্টাফিরে তারে মারি খাও।
যেজন মারিল বান - দলাবান উল্টাফিরে তারে মারি খাও।
যেজন মারিল বান - দাগিনীবান উল্টাফিরে তারে মারি খাও।
যেজন মারিল বান - যোগিনীবান উল্টাফিরে তারে মারি খাও।

যেজন মারিল বান - মগিনীবান উল্টাফিরে তারে মারি খাও।
যেজন মারিল বান - সিজ্রাবান উল্টাফিরে তারে মারি খাও।
যেজন মারিল বান - সিজ্রিবান উল্টাফিরে তারে মারি খাও।
ওঁ দলিং সলিং ক্লীং রিং
ফলনা পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর।

যেকোন পাগলের চিকিৎসায় সর্বাগ্রে বান কাটিয়া ফিরাইবেন। মূর্ত্তিটি কাটার পর কলসীর জলে ও ঘটের জলে রোগীকে স্নান করাইবেন। এইমন্ত্রে একাধিক পাগল আরোগ্য হইয়াছে। পাঁচটাকা পঁচিশ পয়সা ও আসন অচাই এর প্রাপ্য। চাউল রোগীর ঘরের লোক পাক করিয়া খাইতে পারিবে। পরিবারের লোকছাড়া অন্যকে মূর্ত্তির চাউল খাওয়ানো নিষেধ।

১১। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা:

সময়ে পয়সার পরিমান গায়ের চামড়ার উপর সাদা করিয়া দাগ প্রকাশ পায়। চিমটা দিয়া যদি সাড়া পাওয়া না যায় ও লোম যদি উঠিয়া যায় তবে কুষ্ঠ রোগ বলিয়া জানিবেন। ঐ জায়গায় আঘাত লাগিলে বা খোঁচা দিলে তীব্রভাবে চিন চিন করে।

তখন তূলাতে তৈল লইয়া সাতবার মন্ত্র পড়িয়া ঐ তূলার তৈলে বদ্ধ

করিবেন। যে বন্ধ করিবেন নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় তৈল মাখিয়া লইবেন।

তৈলপড়া মন্ত্র বন্ধন মন্ত্র:

১) মন্ত্র:- য়ংমিমা য়ং ব্রাংমা য়ং চেকের
য়ং কেরে ওঁ স্বাহা।

২) য়ং ম্রাদায় ম্রাদায় য়ংমিমা
য়ং ব্রাংমা ওঁ স্বাহা।

নিম্নলিখিত ঔষধে একরাত্র ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া রাখিবেন। ক্ষতস্থানে ভাঙ্গা বোতলের টুকরা দিয়া কাটিয়া রক্ত বাহির করিবেন। তারপর ঔষধ দিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া রাখিবেন।
ঔষধের তালিকা:

১) জিঙ্গা বীচি, (২) তুতিয়া, (৩) চাপাক পার্তা, (৪) জোলাপ বীচি, (৫) সির কাঁথা, (৬) আশু জালি কন্দ - উহা একত্রে মিশাইয়া বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া ব্যান্ডেজ করিবেন। উহা চামড়াসহ উঠিয়া যাইবে,ক্ষত শুকাইলে শুধু দাগ থাকিবে আর রোগ থাকিবেনা। যজ্ঞ ডুমুর পাতায় ঔষধ দেওয়া ক্ষত ঢাকিয়া তারপর বাঁধিবেন।

১) কুষ্ঠ রোগীকে আলাদা ঘরে থাকিতে দিবেন।
২) বাড়ীতে যতজন আছে সকলেই হাতপা জোড়ায় জোড়ায় তৈল মাখিবেন। সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ রোগ ছড়াইলে 'ঠেলাকুং' বীচি নারিকেল তৈলে ভাজিয়া তিনমাস কালে সকাল বিকাল খাওয়াইবেন ও আলাদা ঘরে রোগীকে রাখিবেন।

১২।কয়েকটি আকস্মিক রোগ চিকিৎসা:

রক্ত বন্ধ করার ঔষধ:
দা দিয়া কাজ করার সময় হঠাৎ কাটা যায়। হাত পা বেশী কাটা গেলে , শিরা কাটা গেলে রক্ত সহজে থামেনা। রক্তক্ষরণ অধিকক্ষণ হইলে দুর্বল হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নিম্ন ঔষধে রক্তক্ষরণ বন্ধ হইবে:

ঔষধের তালিকা:

১) দুক মামিং লতার পাতা

২) জলকচুর কন্দ

৩) কাঠ কয়লা

৪) চালার পঁচাশন

৫) গোবর

উপরোক্ত দ্রব্যাদি একত্রে মিশাইলে পীঁড়াতে বা পাথরে দা দিয়া মারিয়া জল দিয়া বাঁটিয়া লইবেন।

গরম জলে কাটাস্থান ধুইয়া জমাট রক্ত ছাড়াইয়া পরিষ্কাব করিয়া ঔষধ লাগাইয়া ও পরিষ্কার নেকড়া দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিবেন।

১৯৮০ সনে সোনাছড়ীতে এক যুবকের হাতে কাটা ঘা গভীর ভাবে ক্ষত হওয়ায় ৩/৪ ঘণ্টা রক্তক্ষরণ হইয়াছিল। শেষে আমাকে খবর দিয়া নিয়া দেখাইলে উপরোক্ত উপায়ে আমি রক্তক্ষরণ বন্ধ করি। তাহাতে ঐ পরিবার যথেষ্ঠ কৃতজ্ঞতা দেখায়।

বিষ ফোঁড়া:

ঔষধের তালিকা-

১) পানের বোঁটা

২) গুল মরিচ

৩) কণ্টিকারীর ফুল

উপরোক্ত দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া বাঁটিয়া ফোঁড়াতে লাগাইলে টন টনানি বন্ধ হয়, পাঁকিয়া পূঁজ যায় ও আরোগ্য হয়। প্রথম অবস্থায় দিলে ফোঁড়া পাকেনা, বসে যায়।

চর্মরোগ চিকিৎসা:

দাউদ (রিং ওয়ার্ম)

কুষ্ঠ রোগ, দাউদ রোগের জীবাণু মৌমাছির ন্যায় রাণী আছে। রানীকে মন্ত্রে ও ঔষধে বশ মানাইতে পারিলে উহা ছাড়িয়া যায়।

ঔষধ:

চালিক লতার ছাল ছাড়াইয়া রস নিংড়াইয়া গরম করিয়া মলমের মত রস বাহির করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ কেরোসিন বা জিঙ্ক অক্সাইড মিশাইয়া মলম তৈয়ার করিতে হয়। উহা ক্ষতস্থানে লাগাইলে দ্রুত রোগ সারিয়া যায়। কোনস্থানে ফোঁড়া হইলে-

পাকা কলা কবুতর বিষ্ঠা মিশাইয়া ফোঁড়ার চারিপাশে লাগাইলে ফোঁড়া পাকিয়া পূঁজ বাহির হইয়া যায়। কোন ফোঁড়ার ঘা যদি চুলকায় নিম্নমন্ত্রে শরিষা তৈল তূলাতে লইয়া মন্ত্রে ঝাড়িয়া ক্ষতস্থানে তৈল লাগাইবার পর তৈলের তূলা আগুন পোড়া দিবে। দুই তিনবার এরূপ করার পর ফোঁড়ার ক্ষত শুকাইবে।

মন্ত্র:- কালমুখ মুখ বন্ধন ।
রাঙামুখ " "।
কালামুগ্রি " "।
রাংগা মুগ্রি " "।

৭ খান পা, ৭ খান হাত হাহার বান্ধন।
এইমন্ত্র যদি লরে ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ে ভূমে পড়ে।
ওঁ স্বাহা।

কজ্জাটি রোগ:

মাথায়, বগলে, কপালে হাতে পায়ে কজ্জাটি হয়। ক্ষতস্থানে ফুটফুট দেখা যায়। অল্প সময়ে উহা বিস্তার লাভ করে। কজ্জাটি রোগ হইলে নিম্নমন্ত্রে চুলার কাঠকয়লা পাউডার করিয়া সাতবার মন্ত্রে ঝাড়িয়া ঐ কয়লার গুড়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে আরোগ্য লাভ করে। ক্ষতস্থানে তৈল লাগাইবেন না।

মন্ত্র:- ওঁ লেপাং লেপাং
ওঁ থু চাথু ওঁং স্বাহা।
প্রতিটি মন্ত্র সাতবার ঝাড়িবার নিয়ম।

উদ্ভেদ চর্মরোগ:

হাজা বা উদ্ভেদ বিখাউস ইত্যাদি অচিনা চর্মরোগ হইলে 'হা ওঁয়াই' দ্বারা উহা শুকাইয়া যায়।

হা ওয়াইঁ নাই:
(প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি)।
১) নূতন মাটির হাঁড়ি ১টি।
২) চরকার সুতা, (কুমারী কন্যা ঋতু না হওয়া কন্যা দিয়া সুতা কাটা)।

৩) একটি মোরগীর ডিম।
৪) থাইচিলিক পাতা।

থাইচিলিক পাতা সাতটা করিয়া সাত বোন্দা মন্ত্র পড়িয়া প্রত্যেক বোন্দা সাতগাছি সূতা দিয়া বাঁধিবেন এবং সাত পাতায় ডিমটিকে জড়াইয়া সাতপাক সূতা দিয়া মন্ত্রদ্বারা বাঁধিবেন। মন্ত্র পড়িয়া সূতা বাঁধিতে হয়। এইগুলি নতুন হাঁড়িতে ঢুকাইয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। সিদ্ধ হইলে নামাইয়া কম্বল ঢাকা দিয়া জলের বাষ্প সর্বশরীরে লাগাইবেন। ইহাতে যাবতীয় অজানা-অচেনা চর্মরোগ হইতে আরোগ্য লাভ হয়।

চর্মরোগ চিকিৎসায় হা ওঁয়াই প্রণালী:
প্রত্যেক ৭ পাতা বোন্ধা চরকার সূতায় মন্ত্র পড়িয়া সাত পাক বাঁধিবেন। ডিমকে সাত পাতা দিয়া জড়াইয়া, সাত পাক সূতা দিয়া সাতবার মন্ত্র পড়িবেন। আর একটা ৪৯ টা পাতার বোন্ধা পাতিলে ৭ বার মন্ত্র পড়িয়া দিবেন। পাতিল ছোট হইলে না দিলেও চলে।

মন্ত্র:- হা চেংখুং মারন, তৈব্রুখর মারন।
তৈ চাকখুং মারন, হাজাখুং মারন
তক্রু হাজা মারন, তমসা হাজা মারন
য়ং সিমা মারন, য়ং ব্রাংমা মারন
অক্ষা কন্যা মোরগী ডিমা কুমার পাতিল থুক। ওঁ স্বাহা।

মন্ত্র পড়িয়া একে একে নূতন মাটির হাঁড়িতে ঢুকাইবেন। উহা জলদিয়া সিদ্ধ করিবেন। পাতিলে সড়া ঢাকনি দিয়া গরম গরম নামাইয়া মোটা কম্বল বা পাছড়া ঢাকনা দিয়া পাতিলের বাষ্প রোগীর ক্ষতস্থানে লাগাইবেন। সাবধান যেন গরম জলে চামড়া পুড়িয়া না যায়। ও গরম জল যেন ছলকিয়া না পরে ।

রোগীর সমস্ত দেহ কম্বল ঢাকা দিতে হইবে উহাতে আস্তে আস্তে সাবধানে গরম জলের হাঁড়ি ঢুকাইয়া বাষ্প ক্ষতস্থানে লাগাইবেন। দিনে একবার প্রতি সন্ধ্যায় এরূপ করিয়া সাতদিনে সাতবার বাষ্প স্থান করার পর পাতিলের সব পাতা বাহির করিয়া ও ডিম ভাঙ্গিয়া দেখিবেন। দেখিবেন, ডিমে কাঁদা, লাল ফেনা জল হাজার বালু, ছোট ছোট পাথর নুড়ি পাওয়া যাইবে, ইহার

পর চর্মরোগ আরোগ্য হইবে।

মখরা ব্যারাম চিকিৎসা:

গলায় একটু একটু ব্যথা। তারপর হঠাৎ শ্বাস নালীতে ফুস্কুরী বড় হইয়া বদ্ধ হয়। তাহাতে রোগী তৎক্ষণাৎ মরে।কথিত আছে মখরা রোগ নাকি উনানে হাঁড়িতে ঘ্বাল ধরাইয়া লবন মরিচ দিয়া রোগীর মাংস তৎক্ষণাৎ লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসে। তারমানে অতি অল্পসময়ে রোগী মারা যায়। সেই জন্য কন্টিকারী শিকড় ছাল ছড়াইয়া রসুন গুলমরিচ দিয়া বাটিয়া বটিকা বানাইয়া শিশিতে ঢুকাইয়া রাখিতে হয়।

আঙ্গুলে ফুস্কা গালিয়া দিবেন। আঙ্গুল নাগালের বাহিরে হইলে সর্বশেষ কলার কচিপাতা উহা দন্ডাকার, উহা দ্বারা আস্তে আস্তে মুখে ঢুকাইয়া পাতলা হাতে ফুস্কা ভাঙ্গিয়া দিবেন। নিম্নমন্ত্রে বারবার ঝাড়িবেন ও বটিকা জলে গুলিয়া খাওয়াইবেন।

মন্ত্র:- ''মখরা মখরি মখরা ছাড়
মৈ পারুয়া ওঁ সুহা।''

চক্ষু চিকিৎসা:

চক্ষুলাল হইলে, আঘাত লাগিলে বুকের দুধ ঝিনুকের খোলে লইয়া চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিবেন। দুমখুং লতা, ঐ লতা টুকরা করিয়া কাটিয়া একপ্রান্তে ফুঁদিলে স্বচ্ছ জল ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। উহা চোখে দিবেন। নিম্নমন্ত্রে পেঁয়াজ মুখে চাবাইয়া মন্ত্র পড়িয়া পেঁয়াজের হাওয়া আস্তে আস্তে চোখে স্পর্শ করাইয়া ঝাড়িবেন। সাবধান যেন পেঁয়াজের টুকরা চোখে না ঢুকে।

মন্ত্র:- ওঁ নমো চাকুদিয়া, চাকু বাঁই থাঁই ভ্রান'ওঁ স্বাহা।

উপসংহার

পার্বত্য জনগনের রোগ ও রোগমুক্তির উপায় হিসেবে আদিম বিশ্বাস অনুযায়ী পূজা, কবচ-মন্ত্র, বনজ ঔষুধের ব্যবহার উল্লেখনীয়। যখন সুচিকিৎসার অভাব ছিল,চিকিৎসার সুযোগে বঞ্চিত ছিল, ত ন ঐ সব চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া তাহারা রোগীর চিকিৎসা করিত। বনজ লতাপাতার গুন অব্যর্থ। উহা উন্নততর করিয়া বিজ্ঞানের আলোকে প্রস্তুত হইলে বহু রোগের সুচিকিৎসার সহায়ক হইবে। অচাইদের জ্ঞানগোচর সূত্র বা জ্ঞ্যান সংগ্রহ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসকগণ আধুনিক নিয়মে ঔষধাদি তৈয়ার করিলে উপকারী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইত।

তবে মন্ত্র, কবচ, পূজা উহা দৈব শক্তি। আচার নিয়ম সংযম দ্বারা সাধকের পবিত্র মানসিক শক্তিতে, দৈবশক্তি ও অলৌকিক শক্তিতে, প্রকৃতির শক্তিতে রোগ আরোগ্য হয়। ইহা সাধারণ চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত নহে। সাধারণত: সন্ন্যাসী পূজারী অচাই ঝাড়াফুকা জল পড়াদি প্রয়োগে মানসিক শক্তি দিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলে। তবুও অচাই বিদ্যার গবেষণা করিলে মানব কল্যান মুখী চিকিৎসার উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। রোগীর প্রথম পর্য্যায়ে ঐ উপায় প্রয়োগ করা হয় এবং রোগ জটিল পর্য্যায়ে পৌঁছিলে হাসপাতালে নেওয়া হয়। আদিম চিকিৎসা বর্তমানে অচল। তবুও গ্রামে গঞ্জে উহা টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসী পার্বত্য জনগণ আদিম বিশ্বাস হইতে এখনও মুক্ত নহে। প্রাচীন প্রথাকে উপেক্ষা করা নয়, এই বিশ্বাস ও চিকিৎসা পদ্ধতির পুন:পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইলে মানবসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হইত।

পরিশিষ্ট

অথ: বুড়াছা আশর কবচ

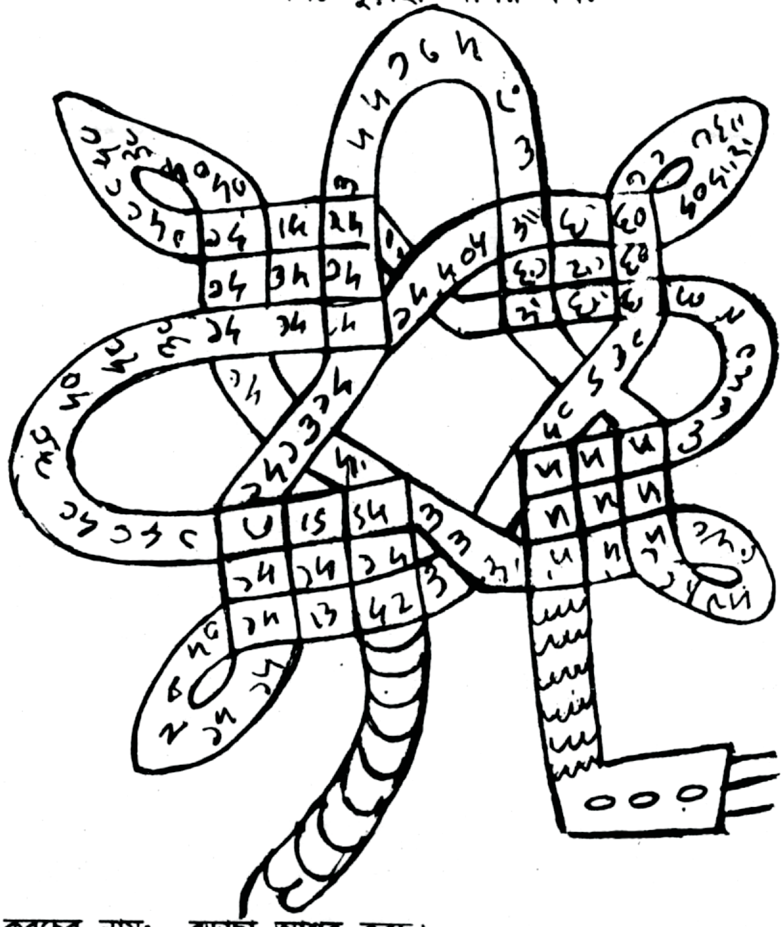

কবচের নাম:- বুড়াছা আশর কবচ।

ঔষধ বা উপকরণ:

(১) খুমায়ুং য়ারাং (চোটা শিকড়)

(২) কারাই য়ারাং (বেত শিকড়)

বিধি:- তামার বা লোহার খোলে উপরের শিকড় সহ কবচ লিখিয়া ঢুকাইয়া শনিবার, মঙ্গলবার ধারণ করিবেন।

উপকার:- শিশু স্বপ্নে ভয় পাওয়া, প্রলাপ বকা, অতিরিক্ত জ্বর ও আশর দোষ হইলে ধারণ করাইবেন।

কোন রমনীর মৃত বৎসা দোষ থাকিলে এই কবচ ধারণ করিবেন।

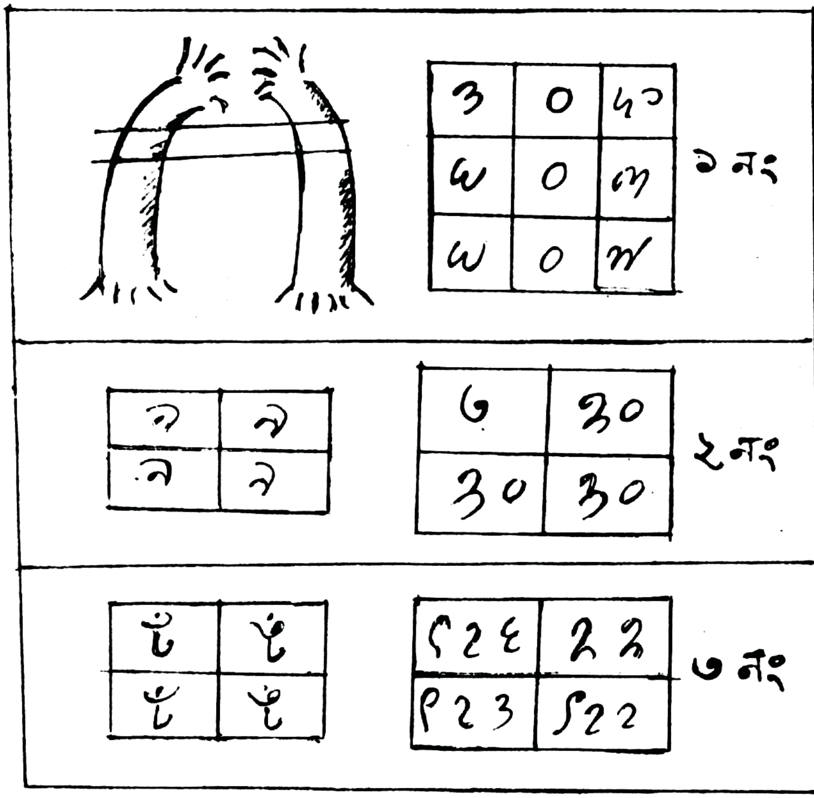

উপরের ১নং ও ২নং ৩নং কবচ কাগজে লিখিয়া পৃথক পৃথক ৩টা লোহার খোলে পুরিয়া মোম দ্বারা কবচ মুখ বন্ধ করিয়া কালসূতা দিয়া কোমরে ধারণ করিবে। শনিবার মঙ্গল বারে ধারণ করা উত্তম।

কবচ মৃত অশৌচ লাগিলে তুলসী পত্রে সোনা ধোয়া জল দিয়া শুদ্ধ করিতে হয়

কবচ জীবিত করার মন্ত্র:-

ওঁ তাইঁলা তাইঁলা, মহাতাইঁলা
শাওন তাঁইলা সব তাঁইলা
ওঁ তাঁই-লা ওঁ স্বাহা।